শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী - ২২১০১০

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

আকৈশোর মাতৃদৃষ্টি করিয়াই যিনি অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত রক্ষা করিয়াছেন, যিনি সহস্র সহস্র আত্মধ্বংসপরায়ণ কামাতুর যুবকের নবজীবন-প্রদায়ক পরমবন্ধু, অসংখ্য বিবাহিত ও অবিবাহিত নরনারী যাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয়ে আসিয়া সংযমে শুভ্র-সুন্দর কল্যাণান্বিত পথ পাইয়াছে, যিনি বহু কুমারীকে কঠোর সংযমের ব্রতোপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের জীবনকে পূর্ণতার পথে পরিচালনা করিয়াছেন, বহু সধবা রমণীকে দাম্পত্য জীবনে দিব্য নিষ্কামতা প্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, বহু অনাথা বিধবাকে চরিত্র-সম্পদ-সমৃদ্ধ মঙ্গলময় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাঁহার সিদ্ধ-তপোবীর্য্য-সম্ভূত রচনা-নৈপুণ্যেরই নিদর্শন। সুতরাং ভূমিকা-স্বরূপে কিছু না বলিলেও চলে। তথাপি প্রচলিত রীতি রক্ষার্থেই মাত্র দুই চারিটী কথা বলিব।

নারীহরণরূপ মহাপাপ আজ সমাজের মর্ম্মস্থলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কেহ বিধবার পুনর্বিবাহ দিয়া, কেহ আন্তর্জাতিক ও অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া, কেহ বা আততায়ী লম্পটকে ধর্ম্মাধিকরণে গুরুদণ্ড দিয়াই এই মহাপাপের উচ্ছেদ-সাধন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু যে অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে নারীহরণ পাপের মূলকে একেবারে উচ্ছেদ করিবার পরিকল্পনা অন্তরে উদিত হইতে পারে, তাহার পরিচয় অধিকাংশ সংস্কারপ্রচেষ্টার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না। স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই নারীহরণলুব্ধতার মূলকে নির্জ্জীব করিয়া দিবার পক্ষে অব্যর্থ উপায়। নির্য্যাতিতা নারীর দুঃখ-বিমোচনের জন্য জনসাধারণের বাহু যে আজ বজ্রসম দৃঢ় ও যমদণ্ডসম উদ্যত হয় না, তাহার মূলেও জনসাধারণের মাতৃ-সম্ভ্রমের

অভাব। পরার্থচেতা মহদ্‌ব্যক্তিরা যখন নির্য্যাতিতা নারীর অসহনীয় দুঃখের চিত্র অঙ্কন করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে শ্রোতৃবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেন, তখন করুণা অনেক শ্রোতারই অন্তরে জাগরিত হয়, কিন্তু কর্ত্তব্য-বুদ্ধির এক অদম্য তাড়না তাহারা অন্তরে উপলব্ধি করে না, যেহেতু অন্তরে মাতৃ-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা নাই। মনে মনে যাহারা প্রতিনিয়ত পরনারীর সঙ্গসুখ অন্যায় জানিয়াও কামনা করিয়া আসিতেছে, সুযোগ পাইলে যাহারা প্রত্যেকে বাঞ্ছিতা পর-নারীর সতীত্বরত্ন যে-কোনও মুহূর্ত্তে কাড়িয়া লইবার জন্য মৃগয়ালুব্ধ দৃষ্টিতে ব্যাঘ্রের ন্যায় ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে, নারীহরণ-প্রতিরোধকামী সমাজ-সেবকের কাতর আবেদনের মর্ম্ম তাহার অন্তরে কতটুকু প্রবেশ করিবে? রহিমদ্দির বা রামনাথের নারীহরণ-মূলক জঘন্য পাপানুষ্ঠানের প্রতিবাদ-সভায় শ্রোতৃরূপে উপবিষ্ট রহিয়া করিমদ্দি বা কাশীনাথ ঠিক তদ্রূপ আর একটী পাপানুষ্ঠানের চিন্তা করিতেছে মাত্র। ওজস্বী বক্তার বাগ্‌বিভূতি-বহুল বক্তৃতার প্রশংসার্থে হাতে সে অজস্র করতালি দিতেছে কিন্তু চিত্ত তাহার মাতৃ-রসসিক্ত নয় বলিয়া, স্ত্রীজাতিতে সে মাতৃভাবের সাধনা করে নাই বলিয়া, বাহিরের এই অভিনয়-চাতুর্য্য তাহার আভ্যন্তর প্রবৃত্তিকে চুলমাত্রও হেলাইতে পারিল না। এই জন্য অন্তর্দ্দর্শী যোগী অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব মাতৃজাতির দেশব্যাপী অবমাননার প্রতিকারকল্পে সমাজ-ব্যাপী মাতৃবুদ্ধির সাধনার সম্প্রসারণকেই মৌলিক উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক সেই একান্ত আবশ্যকীয় মাতৃবুদ্ধির সাধনার ধারার সহিত সম্যক্‌ পরিচিত হইবেন।

এই গ্রন্থ অনেক দিন ধরিয়া রচিত হইয়া অমুদ্রিতাবস্থায় বাক্সের

মধ্যে পড়িয়াছিল। কারণ, অযাচক সন্ন্যাসী অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব যাজ্ঞা-নিরপেক্ষভাবে সমাজসেবা করিয়া থাকেন, প্রার্থনা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করেন না। দেশের যে-কোনও একটা সেবা করিতে হইলেই আবেদনের সানুনয় সম্ভার লইয়া জনসাধারণের দুয়ারে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, ভারতীয় কর্ম্মযোগ-সাধনার ইতিহাসে শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দই সর্ব্বপ্রথম তাহার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ভিক্ষা না চাহিয়া, চাঁদা না তুলিয়া জনসাধারণের করুণা-নয়নের কৃপালু কটাক্ষ-পাতের অপেক্ষা না করিয়া, ইনিই সর্ব্বপ্রথম "অভিক্ষার"র বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া দেশ ও সমাজ-সেবার পথে পদার্পণ করেন। "পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের" নির্ম্মাণ ব্রত আজও সম্পূর্ণ উদ্‌যাপিত হয় নাই, অযাচক আশ্রমের বারাণসীস্থিত মূলকেন্দ্রে আজও সমস্ত পরিকল্পনাগুলি মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই, অযাচক আশ্রমের নানা-প্রদেশব্যাপী বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রগুলি আজও পরিপূর্ণ যৌবনের মহাবীর্য্য আয়তন লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম, এই কথাটুকু সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে,—"অভিক্ষাই নবযুগের সাধনা," ভিক্ষার পথে, চাঁদা সংগ্রহের পথে, দুয়ারে দুয়ারে ধন্না দিয়া সময়ের অপচয়ের পথে আজ চলিলে চলিবে না। "অযাচক আশ্রম" তাঁহার বহুপ্রদেশব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিটি পাদচারণার দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণিত করিয়াছেন যে,—"স্বাবলম্বনই শক্তিমানের পরিচয়-পত্র,"—দুর্ব্বলের ইহা পথ নহে, পরমুখাপেক্ষা নবজাগ্রত জীবনের লক্ষণ নহে। মানভূমের অন্তর্গত

পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম হইতে বিগত ১৩৩৫ বাংলা সাল (১৯২৮ ইং) হইতে প্রতি বৎসর যে সহস্র সহস্র স্থানীয় রুগ্নের বিনামূল্যে চিকিৎসা হইয়া আসিতেছে, লক্ষ লক্ষ ফলবৃক্ষের চারা বিলান হইতেছে, বিনামূল্যে নানাবিধ কৃষিবীজ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের কৃষির উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইতেছে, নানাবিধ কৃষি-প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া পুরস্কারের দ্বারা সকলের কৃষির রুচিকে স্থায়িত্ব দিবার চেষ্টা হইতেছে, বার বার ব্যয়সাধ্য চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ সমাজ-হিতকর বিষয়ে উদাসীন নরনারী-বর্গের মনকেও আগ্রহ-সম্পন্ন করা হইয়াছে,—ইহার একটী কাজের জন্যও "অযাচক আশ্রম" কাহারও নিকট ভিক্ষা সংগ্রহ বা চাঁদা প্রার্থনা করেন নাই। সাহারাণপুর হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে যে দেশের পরমসঙ্কট-মুহূর্ত্তে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব এবং তদীয়া সুযোগ্যা বাগ্মিনী শিষ্যা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তাঁহাদের অতুল বাগ্‌বিভূতির পরমসম্পদের পসরা সাজাইয়া যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বঙ্গদেশ তথা আসামের লক্ষ লক্ষ নরনারীর মোহঘুম ভাঙ্গাইবার বিরাট আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন, তাহাতেও তাঁহারা কাহারও ভিক্ষা, চাঁদা, দান বা অনুগ্রহের পানে তাকাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যেখানে তাঁহারা গিয়াছেন, একটী যুগান্তরকারী ভাব-বিপ্লব যে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্ঝার বল নিয়া, বিদ্যুতের গতি নিয়া, সূর্য্যের তেজ নিয়া, চন্দ্রমার স্নিগ্ধতা নিয়া, নন্দনোদ্যানের কুসুম-সুরভি নিয়া, ঋষি-যুগের শান্তি নিয়া, বৈদিক ভারতের শিক্ষা নিয়া, আত্মপ্রসাদের তৃপ্তি নিয়া, মৃত্যুঞ্জয়ের বীর্য্য নিয়া প্লাবনের প্রবল প্রবাহে আসিয়া পড়িয়াছে,

ইহা প্রত্যেককে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। দেরাদুন কি শিলং, গৌহাটি কি কলিকাতা,—কোনও স্থানেই তাঁহাদের এই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবানুভব সম্পর্কে চিরন্তনী রীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই। কিন্তু এত বড় কার্য্য করিবার কালে তাঁহারা কাহারও নিকট কপর্দ্দক মাত্র চাঁদা প্রার্থনা করেন নাই।

ভারতীয় কর্ম্মি-সমাজে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের এই অসাধারণ কৌলীন্য বাঙ্গালীর গৌরব, ভারত-বাসীর শ্লাঘা, অধঃপতিত দেশবাসীর পুনরুত্থানের পরম ভরসা ও আশার নিদর্শন। এমন এক অদ্বিতীয় শক্তিধর মহামহর্ষির রচিত এই "স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণখানা জন-সাধারণের হস্তে তুলিয়া দিবার কালে মাত্র এই আশাই পোষণ করিতেছি যে, মানবের মনোমধ্যে অতিশয় সঙ্গোপনে অবস্থিত নারীর মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী পাপ ইহার প্রচারের প্রভাবে স্থায়ী ভাবে নির্ম্মূল হইবে।

বাংলা ১৩৪১ এর বৈশাখ মাসে ফেণী শহর হইতে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুই সহস্র গ্রন্থ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়, কিন্তু "অযাচক আশ্রম" অযাচক বলিয়াই এতকাল ইহার পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয় নাই; পুস্তক-বিক্রয় হইতে যাহা যখন আয় হইয়াছে, তাহাই তখন জনহিতার্থে ব্যয়িত হইয়াছে। মধ্যে পরপর দুইটী বিভিন্ন যৌথ প্রতিষ্ঠানকে পুস্তকসমূহ প্রকাশের ভার দেওয়াতে তাঁহাদের চেষ্টার প্রত্যাশায় প্রায় এগারটি বৎসর বৃথা কাটিয়া গেল। এই সকল কারণেই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল। সতের বৎসর পরে

নিবেদন

অতি বিলম্বে প্রকাশিত হইলেও এই মহাগ্রন্থ ভারতের নব যুবকদের প্রাণে নূতন প্রেরণা প্রদান করিয়া প্রত্যেকের অন্তরে শুচিতার সৃষ্টি করিবে। এই আশা লইয়াই উপসংহার করিতেছি। এই সংস্করণে পুস্তক সামান্য পরিবর্দ্ধিত এবং সংশোধিত হইয়াছে। ইতি—ভাদ্র, ১৩৫৮সন।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-২২১০০১

নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

মাতৃ-অঙ্কে স্বরূপানন্দ
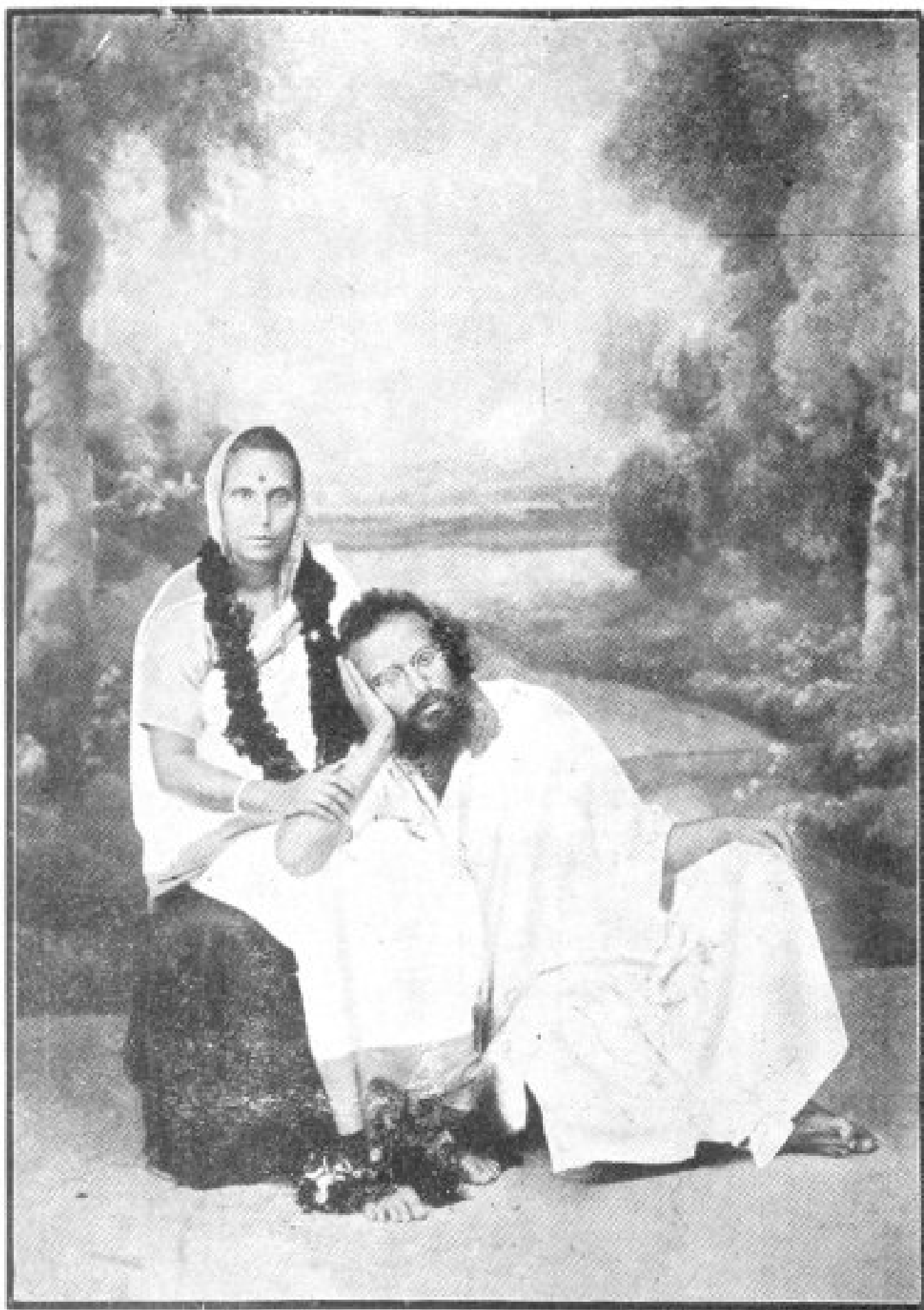
স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাতৃভাবের আবশ্যকতা

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শাস্ত্রকারগণের যে সকল উক্তি অধিকাংশ শাস্ত্রের পত্রে পত্রে বিকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শাস্ত্রকারদের প্রতি অনেকেরই তীব্র বিতৃষ্ণা, বিরাগ এবং কতিপয় স্থলে অশ্রদ্ধা উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা। নারীর প্রতি নিন্দা, ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপ্রীতি ও অনাদরসূচক সেই সকল উক্তির মূল কোথায়, তাহা কিন্তু আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। যে কারণেই হউক, অধিকাংশ শাস্ত্রকার পুরুষদিগকেই উপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং সঙ্কট-সঙ্কুল সুবন্ধুর গহন জীবন-পথে তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইবার সঙ্কেত ও সন্দীপনা প্রদান করিতেছেন। শুধু স্ত্রীজাতিকে উপদেশ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে কোনও শাস্ত্র এতাবৎকাল প্রণীত হয় নাই এবং পুরুষজাতি সম্বন্ধে কর্কশ বা পরুষ উক্তি প্রয়োগেরও প্রয়োজন পড়ে নাই। শাস্ত্র-গ্রন্থাদি রচনার যুগে সর্ব্বজনীনভাবে শাস্ত্রাদিতে যদি নারীজাতির পূর্ণ অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, স্ত্রীজাতির আত্মগঠনের জন্য সতর্কতামূলক বহু উক্তি পুরুষ-জাতির বিরুদ্ধেও তীব্র ভাষায় অবশ্যই প্রযুক্ত হইত। আদি

যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত পুরুষ-জাতীয় লোকেরা শত শত নারীর সমক্ষে কম প্রলোভন বিস্তার করে নাই, সহস্র সহস্র নারীকে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত করিতে অল্প প্রয়াস পায় নাই, নিজেদের ভোগের অনলে ইন্ধনরূপে অল্পসংখ্যক নারীকে দগ্ধ করে নাই,—পুরুষের কুচক্রান্তে, পুরুষের বিশ্বাস-ঘাতকতায়, পুরুষের নিষ্ঠুরতায়, পুরুষের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ নারী "ত্রাহি মাং মধুসূদন" বলিয়া কাতর আর্ত্তনাদ করিয়াছে এবং আজও করিতেছে। যুগে যুগে রাবণ হইতে আরম্ভ করিয়া তারকেশ্বরের মোহন্ত বা হীরালাল আগরওয়ালা পর্য্যন্ত শত শত নারী-পীড়ক নারীকে ছলনায় ভুলাইয়া পাপপথে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং পরিশেষে তাহাদিগকে ঘৃণিত, ধিক্‌কৃত, কলুষিত, কদর্য্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু, তথাপি শাস্ত্রকারগণ যে এই পুরুষজাতিকে "নরকের দ্বার" বলিয়া কীর্ত্তন করেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের শাস্ত্রের শ্রোতা পুরুষজাতি,—নারী নহে। শহরের রঙ্গমঞ্চে শহুরে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাগ্‌-বিভূতি-সম্পন্ন বক্তাও যখন অভিভাষণ প্রদান আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে শহুরে শ্রোতার উপযুক্ত বাক্যাবলীই নিঃসৃত হয়, পল্লীর অন্ধকারে দীন পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে

ম্যালেরিয়ায় কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্ন কন্থায় শরীর ঢাকিয়া প্লীহা-স্ফীতোদর ও কঙ্কাল-সার তনুকে মৃত্যুর বিকট বদন-বিস্তার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে চিরদুঃখী পল্লীবাসী খাটিয়া মরিতেছে, তার উপযুক্ত, তার প্রয়োজনীয়, তার আশু-উপকারক বাণী তাহাতে অতি অল্পই থাকে। স্বেচ্ছায়ই আমরা নারীকে শাস্ত্রালোচনার অধিকার হইতে দূরে সরাইয়া দিয়া থাকি কিম্বা তাঁহারাই গৃহকার্য্য-ব্যস্ততা বশতঃ একমাত্র পতিভক্তিকেই সার করিয়া স্বেচ্ছায় নিজেদিগকে শাস্ত্র-সমুদ্রের ঘনঘোররোলপুর্ণ রুদ্র আলেখ্য দর্শন হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকুন, শেস ফল কিন্তু এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিমহর্ষিদের রচিত বিবিধ শাস্ত্রাবলীর শ্রোতা নহেন,—এবং শ্রোতা নহেন বলিয়াই একজন প্রলোভন-বিচলিত পুরুষকে নারীজাতি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিলে তাহাকে প্রলোভন-দমনে সাহায্য করা যাইতে পারে, সুশ্রাব্য হউক আর অশ্রাব্য হউক, শাস্ত্রকারগণ তার প্রত্যেকটি কথা নিজ নিজ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—রমণীই পুরুষরূপী গজরাজকে রতিশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিবার স্তম্ভ, রমণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া পুরুষ-পতঙ্গ নিজেকে আহুতি দেয়, রমণীই পুরুষের সকল মঙ্গলের পরম বিঘ্ন। রমণী মদিরার ন্যায় পুরুষের

চিত্তকে বিকারগ্রস্ত করে, পুরুষের কর্ত্তব্য-কর্ম্মের বিলোপ সাধন করে, কামান্ধতা দ্বারা পুরুষের জ্ঞান-হরণ করে, বিষলতার ন্যায় পুরুষের প্রাণ-বিনাশ করে। রমণী বড়শিস্থিত পিষ্টক-খণ্ডের ন্যায় পুরুষ-মৎস্যকে প্রলুব্ধ করে এবং সুখের লোভ দেখাইয়া পরম দুঃখ দান করে।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—এই যে কুরঙ্গ-নয়না নারী, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ভুল, এই নয়ন এখন তোমাকে আকর্ষণ করিবে, কিন্তু পরিণামে নরকানলে দগ্ধ করিবে। এই যে ভ্রূযুগ-শালিনী নারী, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমার ভুল, আজ যে ভ্রূযুগ অপূর্ব্ব চারুতায় তোমার নয়ন-মোহকর, কাল তাহা কালসর্পের ন্যায় তোমাকে দংশন করিবে। এই যে বিপুল-করবী-ভারা কমনীয়া নারী, ইহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ভুল,—ঘনান্ধকার-সদৃশ এই অলকজাল তোমার কল্যাণ-চেতনাকে নিমেষ মধ্যেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। এই যে শশধর-বদনা সুন্দরী নারী, ইহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ভুল,—ইহার মুখের হাসি বাতাসে মিশাইবে, বদনের জ্যোৎস্না অমানিশীথিনীর তিমিরাবরণকে লজ্জা দিবে, তোমার প্রজ্ঞাদৃষ্টি কাড়িয়া নিবে। এই যে মুক্তা-বিনিন্দিত-চারু-দশনাবলী-সমন্বিতা বিম্বাধরা নারী, ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইও না, এই মুক্তাপংক্তি বজ্র-সমষ্টিতে পরিণত হইবে,

এই বিম্বাধর কালের করাল গ্রাসে রূপান্তরিত হইবে, দারুণ মর্ম্মদাহের মধ্যে তোমাকে জীবন্ত ইহা চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। এই যে স্তন, এই যে নিতম্ব, এই যে মন্থমন্থরগামী অলক্তক-শোভিত চরণ-যুগ, সবই তোমাকে দলন করিবার জন্য উদ্যত রহিয়াছে,—অতএব নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইও না। এই যে তাহার কমনীয় কোমলতা, ইহা ব্যাধের জাল মাত্র। এই যে তাহার কোমল করপল্লব, ইহা বলিদানার্থ ছাগ-সংগ্রহের কৌশল মাত্র। এই যে তাহার বীণাবিনিন্দী কণ্ঠস্বর, ইহা সাপুড়িয়ার বাঁশী মাত্র। এই যে তাহার পারিজাতগন্ধী শ্বাসবায়ু, তাহা শ্যামল-শষ্পাস্তৃত কুসুম-কাননকে মরুভূমিতে পরিণত করিবার বিষাক্ত বাষ্প মাত্র। অতএব, হে মানব, নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইও না, রতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইও না, অজ্ঞানতাবশে মদনানলে ঝাঁপ দিয়া অকালে প্রাণ হারাইও না।

শাস্ত্রকারেরা আরও বলিয়াছেন,—রমণী কি বাস্তবিকই রমণীয়? আমরা ত' দেখিতেছি, ইহাতে রমণীয়ত্ব বিন্দুমাত্রও নাই। শিরা-কঙ্কাল-গ্রন্থি-শালিনী মাংস-পুত্তলী রমণীর যন্ত্রবৎ চঞ্চল অঙ্গসমূহে প্রকৃত পক্ষে শোভার সামগ্রী কি আছে? হে জীব! মধুর নয়নার খঞ্জনা-গঞ্জন লোচন-যুগল এবং নব-নীত-কোমল চর্ম্ম-তল বিশ্লেষণ করিয়া দেখ,—উহাতে সুন্দর কিছুই নাই; মনোরম কিছুই নাই। এখানে কেশ, ওখানে

শোণিত,—ইহা লইয়াই ত' প্রমদার প্রমাদ-পঙ্কিল কলেবর। এখানে অস্থি, ওখানে মাংস, ইহাই ত' রূপসীর সকল রূপের পরম সম্বল। এখানে মেদ, ওখানে মজ্জা, ইহাই ত' তাহার মনোহর শরীরের অত্যুৎকৃষ্ট উপাদান। এখানে মল, ওখানে মূত্র, ইহাই ত' চিত্ত-বিভ্রম-কারিণী তম্বঙ্গীর আভ্যন্তর গৌরব! মুখ বল, বক্ষ বল, কটিতট বল, রক্ত-মাংস প্রভৃতির সমাবেশ ব্যতীত ত' ইহা আর কিছুই নহে। যে শরীর আজ দিব্যগন্ধানুলেপনে লালিত, মৃত্যুমাত্র তাহা তোমার অস্পৃশ্য হয়,—অগ্নিতে উহা দাহ্য, নতুবা মৃত্তিকাতে উহা প্রোথিতব্য,—চিল-শকুনির, শৃগাল-কুক্কুরের উহা উপভোগ্য। হে মানব, যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহার পরিণতি হয় অঙ্গারে নতুবা কর্দ্দমে, যাহার শেষ বাসস্থান শকুনির উদরে, নয় সারমেয়-জঠরে, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইও না।

কথাগুলি অত্যন্ত শ্রুতি-বীভৎস সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব-মনের এমন একটা নিদারুণ অবস্থা আছে, এমন একটা অধোগামিনী প্রবণতা একটা সময়ে মানবের চরিত্র-মধ্যে প্রকটিত হয়, তখন এইরূপ উপদেশেরও একটা সার্থকতা আছে। কুচিলা অতি তিক্তস্বাদবিশিষ্ট অনুপাদেয় বিষ কিন্তু রোগের এমন লক্ষণ আছে, যখন তাহা সেবন করাইতে হয় এবং বিষের প্রয়োগের দ্বারা শরীর-মধ্যস্থ অপর বিষের

প্রতিক্রিয়া রুদ্ধ করিতে হয়। নারী-নিন্দা বিষতুল্য অমেধ্য ও অহিতকর কিন্তু মানব-মনের এমন কামপঙ্কিল জঘন্য অবস্থা আছে, যখন এই বিষ অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। যৌবন যেখানে উচ্ছৃঙ্খল, যৌবনের চিত্ত-চাঞ্চল্য যেখানে অপ্রতিরুদ্ধ, যৌবন-মোহে মানব যখন সদাচার-বিস্মৃত, তৃষ্ণাপীড়ায় মন যখন তাহার বাত্যা-বিতাড়িত ময়ুর-পুচ্ছবৎ চঞ্চল, সন্তাপ-সঙ্কুল কামের প্রাবল্যে যখন সে হিতাহিত-বুদ্ধি-বর্জ্জিত, তখন নারী-সংসর্গের বিষময় কুফলের কথা, নারী-রূপের অনিত্যতার কথা, নারী-শরীরের ক্লেদ-পূযাদি উপাদানের ঘৃণ্যতার কথা স্মৃতিপথে জাগাইয়া দিয়া তাহার পাপ-লুব্ধ মনকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টার প্রয়োজন আছে। নদী-তরঙ্গের ন্যায় অস্থির মন যখন বিধিনিষেধের তীরভূমিকে সবলে ভাঙ্গিতে চায়, কল্পনা-শয়নে শয়ান রহিয়া ভ্রান্ত মানব যখন দুরাশা-বিজড়িত অন্ধ আকুলতায় বাহু বাড়াইয়া অলঙ্ঘনীয় মর্য্যাদাকেও লঙ্ঘন করিতে চায়, আশা-পিশাচীর দুরন্ত নৃত্যে যখন নিতান্ত অগম্য স্থানেও চরণ প্রসারিত করিতে সাহসী হয়,—সেই অধঃপাতের চরম সীমায় নারী-শরীর বিশ্লেষণ করিয়া, ইহার মধ্যে যে সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, তাহা বলিবার প্রয়োজন আছে। কামিনী-কামনা যখন গম্ভীর মানবকেও অধীর করে, সবল চিত্তকেও সংজ্ঞাহীন করে, সদাচারী পুরুষকেও নিতান্ত কদর্য্য-কলুষিত কদাচারে প্ররোচিত

করে, তখন একথা বলিবার প্রয়োজন আছে যে, মলমূত্র ও কৃমি-কীটাদির আবাসভূমি নারী-দেহ তোমার লালসার যোগ্য নহে। তখন বলিবার প্রয়োজন আছে যে, দুর্ভাগ্যদায়িনী তৃষ্ণা যে রমণীকে তোমার পরম সুখদায়িনী বলিয়া ভ্রমোৎপাদিত করিতেছে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার সর্ব্বনাশ-বিধায়িনী পরম-অমঙ্গলকারিণী, নিখিল-সুখ-বিনাশিনী, কাল-নাগিনী মাত্র। এইজন্যই শাস্ত্রকারেরা বহু স্থলে রমণীজুগুপ্সা করিয়াছেন। অবশ্য বলাই বাহুল্য, এই নিন্দাভাষণগুলি স্ত্রীজাতিকে শ্রবণ করাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা নানালঙ্কারসুচারু ও শব্দ সৌষ্ঠব-শালিনী শ্লোকাবলী অত্যন্ত শ্রম সহকারে রচনা করেন নাই।

কিন্তু পুরুষের কাম-প্রবণ মনকে কামায়নকণ্ডূতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য পন্থাও আছে। নারীকে রক্ত-পিপাসু রাক্ষসী কল্পনা না করিয়াও তাঁহার প্রতি প্রধাবিত দুরন্ত তৃষ্ণাকুল মনকে শাসন করিবার পথ আছে। নারীজাতিকে মস্তক-চর্ব্বণ-কারিণী পিশাচিনী বলিয়া কল্পনা না করিয়াও মনকে প্রশান্ত করিবার উপায় আছে। সে উপায় "স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের" আরোপ। যে নারী তোমার সর্ব্বকল্যাণঘাতিনী, সেই নারীই তোমার সর্ব্বমঙ্গলপ্রদায়িনী হইবেন, যদি তাঁহাকে "মা" ভাবিতে পার। যে নারী তোমার বক্ষ-রক্তশোষিণী, প্রাণ-বিনাশিনী, সেই নারীই তোমার স্তন্য-রস-প্রদায়িনী, নবজীবন-বিধায়িনী হইবেন, যদি তাঁহাতে মাতৃবুদ্ধি অর্পণ করিতে পার। যে নারী

এখন তোমার চিত্ত-বিকার-কারিণী, সেই নারীই তোমার চিত্তস্থৈর্য্য-সাধিনী হইবেন, যদি তাঁহাকে স্বকীয় গর্ভধারিণী জননী বলিয়া জ্ঞান কর। যে নারী মদিরার ন্যায় তোমার স্মৃতি-বিলোপ-কারিণী, কর্ত্তব্য-জ্ঞান-নাশিনী ও কামোন্মত্ততা-বিধায়িনী, সেই নারীই তোমার আঁখির অগ্রভাগে আত্মস্মৃতি-সম্পাদিনী, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রদায়িনী, চিত্তোন্মাদ-বিনাশিনী সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিবেন, যদি তুমি প্রাণ ভরিয়া একবার তাঁকে "মা" নামে ডাকিতে পার। ভাবিতে হইবে না, এই নারী শিকারীর ফাঁদ, এ নারী পতঙ্গ-দহনের লেলিহান বহ্নি-রসনা,—যদি তাঁকে একবার "মা" বলিয়া অনুভব করিতে পার। প্রমদার পীন পয়োধর একদিন শৃগালের খাদ্য হইবে, না, তাহার নাড়ী ভুঁড়ি শকুনিতে টানিয়া ছিঁড়িবে, মনে মনে সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে না, একদিন তার পুষ্পকেশর-সন্নিভ কোমল অঙ্গ শ্মশানানলে দগ্ধ হইবে, না, কঙ্কালমালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ভয়প্রদ দৃশ্যের অবতারণা করিবে, সেই গবেষণাও করিতে হইবে না,—যদি নারীমাত্রকেই মাতা বলিয়া গ্রহণ কর। যৌবন-পীড়ার নিষ্ঠুর আক্রমণে যে ব্যতিব্যস্ত, যৌবন-চাপল্যের নির্ম্মম তরঙ্গাভিঘাতে যে বিপন্ন, আত্মরক্ষার এই পরম সুষ্ঠু পথ তাহার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। যে এ পথে চলিবে, মদনানলের জ্বালামালা তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না, হাসিতে হাসিতে সে জীবনের দুর্গমতম

মরু-প্রান্তর, বন্ধুরতম গিরি-কান্তার অনায়াসে, অকাতরে, অবহেলে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

বাস্তবিক, যৌবন বড় বিষম কাল, বড় বিপজ্জনক এই সময়, যেন জীবনমরণের এক মহাসন্ধিক্ষণ। যৌবনারূঢ় হওয়া আর অধঃপাতের প্রথম সোপানে আসিয়া দাঁড়ান, প্রায় এক কথা। অকারণে এই সময় চিত্ত নানা বিলাস-বিভ্রমে বিচলিত হয়, বর্ষাকালের জলধারার ন্যায় আপনি সে আবিল, দূষিত ও বেগবান্ হয়। এ সময়ে পুরুষের চিত্ত নারী-সম্পর্কে নানা কদর্য্য বাসনায় ক্লিষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এ সময়ে রমণী-চিন্তায় পুরুষের অস্থির চপল মন নানা দুঃখ-প্রদায়িনী দুশ্চিন্তার আকরে পরিণত হওয়া আশ্চর্য্য কিছু নহে। বরং যৌবন-যামিনীর সমাগমে কামনা-বাসনা-রূপিণী ঘৃণ্য-বিষয়-লোলুপা পিশাচাঙ্গ-নাদের অসম্বৃত নৃত্যের অপ্রাচুর্য্যই এ জগতে অত্যন্ত অস্বাভাবিক, শরীর-নিকুঞ্জে যৌবন-ফুল-মঞ্জরীর অত্যুদ্গমে লালসারূপিণী মধুকরীর উন্মত্ত-গুঞ্জন অবিরত শ্রুত না হওয়াই এ জগতে এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা। যৌবনে চাঞ্চল্য হওয়া বিধাতৃ-বিহিত এক দুর্লঙ্ঘনীয় প্রকৃতি, আবার পরমেশ্বরেরই নির্দ্দেশে এই প্রকৃতির উপরে সুধী-পুরুষ আত্ম-সংযমের বিজয়-পতাকা সগৌরবে উড্ডীন করিয়া থাকেন। যে উপায়ে যৌবনের চপলচিত্ত অতি সহজে, অনায়াসে বশীকৃত হয়, স্থির হয়, প্রশান্ত হয়, সেই উপায়ের নাম "স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব"।

মাতৃভাবের আবশ্যকতা

মহানরকের মূলীভূতা কামপরতন্ত্রতা যাহার চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, বিবেক-বুদ্ধির অস্থিমজ্জা চিবাইয়া খাইতেছে, "স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব" তাহাকে পুনরায় দৃঢ়মজ্জ, দৃঢ়াস্থি ও সবল-মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট করিবে। বলিতে কি, পরপদানত এই দুর্গত ভারতের অভ্যুদয়ের মহাবীজ নিহিত রহিয়াছে, এই স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাবের সুকঠোর সাধনার পূর্ণ সিদ্ধিতে।

জীবন জাগিয়ে তোল দুর্ব্বার বিক্রমে
দুর্ব্বলতা করি' পরিহার,
হৃদয়ের লুক্কায়িত দিব্য পরাক্রমে
নিজে কর নিজেরে উদ্ধার।
চঞ্চলতা, দুষ্টবুদ্ধি, ঘৃণ্য পাপপথ
সব আজি করিয়া বর্জ্জন,
অন্তরের তপস্যার শক্তি সুমহৎ
নিষ্ঠাবলে করহ অর্জ্জন।
প্রজ্ঞার অনলে পাপ দগ্ধিয়া মরিয়া
চিরতরে দূর হ'য়ে যাক্,—
জগতের সর্ব্বনারী মাতৃমূর্ত্তি নিয়া
নয়নের সম্মুখে দাঁড়াক্;
মায়ের মঙ্গল-করে উপাড়িয়া
লালসার লেলিহান লতা,
প্রতিটি রমণী আজ দেবীত্ব লভিয়া
হোক্ তব মঙ্গল-বিধাতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাতৃভাবের সাধনা

ঐ যে রমণী কলসী-কক্ষে মৃদু-মন্দ-গমনে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত আননে সরসী-তট হইতে পল্লীবীথি বাহিয়া স্বীয় কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, কে ঐ রমণী জান? উনি তোমার মা। যদি পল্লীবাসিনী হইতেন, যদি সম্পন্ন গৃহের বধূ না হইতেন, তবে তোমার গর্ভধারিণী জননীকেও এমনি করিয়া প্রতিদিন গৃহ হইতে জলাশয়-সমীপে আসিতে হইত, কলসী ভরিয়া জল লইয়া এমনি করিয়া শত চক্ষুর সম্মুখ দিয়া গমন করিতে হইত। দৃষ্টির চটুলতা পরিহার কর, মায়ের প্রতি অশুদ্ধ, অসম্ভ্রান্ত ও অশিষ্ট দৃষ্টিতে তাকাইও না, চক্ষু ফিরাও।

ঐ যে রমণী সখী-জন-সমভিব্যাহারে বিশ্রব্ধ আলাপনে নিমগ্না, হাস্য-কৌতুকে সমগ্র·দিবসের শ্রমক্লিষ্ট চিত্তকে সাময়িক বিনোদনে নিরতা,—কে ইনি জান? ইনিও তোমার মা। দিবসব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে ক্লিষ্টতনু তোমার জননীও সাময়িক চিত্ততোষার্থে সখীগণ সঙ্গে এমনি করিয়া রহস্যামোদে নিমগ্না হন। সংযত কর তোমার অসংযত দৃষ্টি, মায়ের প্রতি এইভাবে তাকাইতে নাই।

ঐ যে রমণী স্নানাবসানে সিক্ততনু গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা অসম্পূর্ণ ভাবে মুছিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিহার করিয়া বস্ত্রান্তর পরিধানে সচেষ্টা—কে ইনি জান? ইনিও তোমার মা। তোমার গর্ভধারিণী জননীকেও অবগাহনান্তে এমনি করিয়া প্রতিদিন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ছিঃ, এভাবে ওদিকে তাকাইও না। মায়ের সম্ভ্রমে পদাঘাত করা সন্তানের কখনো সাজে না।

ঐ যে রমণী উদ্যান-পথে পুষ্প-চয়নে নিরতা, হাসিতে যাহার বদন-বিবরে মুক্তা-পংক্তির বিকাশ ঘটিতেছে, নয়নে যাহার স্নিগ্ধ জ্যোতির্ধারা গলিয়া পড়িতেছে, মুখমণ্ডলে যাহার লাবণ্যের ফোয়ারা ছুটিতেছে,—কে ইনি জান? ইনিও তোমার মা। সন্তানের মঙ্গল-কামনায় দেবার্চ্চনার জন্য তোমার জননীকেও এমনি করিয়া পুষ্প চয়নে কুসুম-কাননে আসিতে হয়, ফুলদলের ফুল্ল মুখারবিন্দ দর্শনে হরষিত কমলাননে তাঁরও এমনি হাসি ফোটে, পবিত্রতার ভাতিতে তাঁহারও মুখ-চন্দ্রমা রূপের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়। শালীনতা-বর্জ্জিত কুৎসিত দৃষ্টি সম্বরণ কর, পশুর মত লোলুপ নেত্রে ঐ দিকে চাহিও না।

ঐ যে বাতায়ন-মুখে পথ-প্রান্তে নিবদ্ধ-দৃষ্টি আবেগাকুল-নেত্রা রমণী কার আগমন-প্রতীক্ষায় অধীরা হইয়া অসূর্য্যম্পশ্যা মুখমণ্ডল পথিক মাত্রেরই দৃষ্টিগোচর করিয়া দিয়াছে, ললাটে

তার সুন্দর সিন্দূর-বিন্দু, অযত্ন-বিন্যস্ত চূর্ণ-কুন্তল আলু-থালু, শিরোভাগে অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত,—কে ঐ নারী বলিতে পার? ইনিও তোমার মা। দূরদেশ হইতে দীর্ঘকাল ব্যবধানে তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় তোমার জননীও এমন করিয়া উৎকণ্ঠিত দিন-যামিনী যাপন করেন, এম্‌নি করিয়া বাতায়ন-পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, অধীর আগ্রহ-ব্যাকুলতায় তিনিও অবগুণ্ঠন টানিতে ভুলিয়া যান, সামাজিক লজ্জা-সরম বিস্মৃত হইয়া তিনিও নিজেকে আবেগাকুল সন্তান-স্নেহের তাড়নায় বহুজনের নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী করেন; মায়ের প্রতি রতিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতে নাই,—চক্ষু ফিরাও।

ঐ যে রমণী ভিক্ষা-পাত্র হস্তে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দুমুঠা অন্নের জন্য কটুক্তি শ্রবণ করিতেছে, রূপ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের কদর্য্য প্রস্তাবে যে শত পদাঘাত করে, বক্ষোপরি সংস্থাপিত ক্ষুদ্র শিশু যার জীবনের প্রধান কণ্টক অথচ জীবনের সারধন সর্ব্বাবলম্বন,—কে ঐ রমণী জান? ইনিও তোমার মা। অদৃষ্টবশে অকালে স্বামীহারা হইলে, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের তীক্ষ্ণ গঞ্জনে পরিক্লিষ্টা হইলে, মিথ্যা অপবাদে সমাজ-পরিবর্জ্জিতা হইলে স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় পরিমার্জ্জিতা না হইলে তোমার জননীকেও এমনি করিয়া ভিক্ষা-করঙ্ক-করে গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে হইত, শিশু-সন্তানটাকে মরণের

গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নীবার-কণা-সংগ্রহার্থে শত জনের শত লাথি-ঝাঁটা খাইতে হইত, একাকিনী পল্লী-গ্রামের জঙ্গলাবৃত বাঁশ-বনের বিপজ্জনক পথে বিচরণ করিতে হইত। **ফিরাও চক্ষু ঐ দিক হইতে,—ঐ নারী তোমার মা।**

জগতের যত রমণী, সকলই তোমার মা। একজনেও তোমার মাতা ব্যতীত অপর কিছু নহেন। একজনের প্রতিও তুমি সন্তানের অযোগ্য চক্ষে তাকাইতে পার না। একজনের সম্পর্কেও সন্তানের অযোগ্য ভাষা প্রয়োগ করিতে তুমি পার না। ঐ যে নারী দাসীবৃত্তি করিয়া জীবিকার্জ্জন করে; ঐ যে নারী ধাঙ্গরের কাজ করে, ঐ যে নারী মল-পাত্র হস্তে লইয়া প্রতি গৃহের মলস্থান পরিষ্কৃত করে, মলভাণ্ড মস্তকে ধরিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিচরণ করে, **ইহারা প্রত্যেকে তোমার মা, তোমার জননী।** কর্ম্মবশে বর্ত্তমান জননীর গর্ভে না জন্মিয়া ইহাদের যে-কাহারও জঠরে তুমি জন্মগ্রহণ করিতে পারিতে, কর্ম্মাধীন তুমি দাসীপুত্র, ধাঙ্গর-তনয় বা মেথর-নন্দন হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে পারিতে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে এই দাসীরই স্তন্য পান করিয়া তোমাকে জীবিত থাকিতে হইত, এই ধাঙ্গরাণীর বক্ষ-ভরা স্নেহ-রস-সঞ্জীবনে তোমাকে প্রাণ ধারণ করিতে হইত, এই মেথরাণীর ক্রোড়ে নাচিয়া নাচিয়া হাতে তালি দিতে দিতে তাহাকে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে হইত।

এই ভাবে, চক্ষের উপরে যে-কোনও রমণী-মূর্ত্তিই জাগুক, তৎক্ষনাৎ তাহাকে তোমার গর্ভধারিণী জননীর সহিত তুলিত করিবে। এই রমণীতে আর তোমার জননীতে যে বস্তুগত্যা কোনও পার্থক্য নাই, এইরূপ চিন্তা করিবে; এই রমণীর শরীর যে তোমার মায়েরই শরীর, এই রমণীর রূপ যে তোমার মায়েরই রূপ, এই রমণীর বয়স যে তোমার মায়েরই বয়স, এইরূপ চিন্তা করিবে। এই রমণীর চক্ষুর্দ্বয় যে তোমার মায়েরই লোচন-যুগল, এই রমণীর মুখমণ্ডল যে তোমার মায়েরই হাস্যময়ী আস্য, এই রমণীর কেশ-পাশ যে তোমার মায়েরই অলকদাম, এই রমণীর হস্ত-পদাদি সর্ব্বাঙ্গ যে তোমার মায়েরই সর্ব্বাঙ্গ, এইরূপ চিন্তা করিবে। এই রমণীর সুখ-দুঃখ যে তোমার মায়েরই সুখ-দুঃখ, এই রমণীর শুভাশুভ যে তোমার মায়েরই শুভাশুভ, এই রমণীর উত্থান-পতন যে তোমার মায়েরই উত্থান-পতন, এইরূপ চিন্তা করিবে। এই রমণীর মান-অপমান যে তোমার মায়েরই মান-অপমান, এই রমণীর গৌরব-অগৌরব যে তোমার মায়েরই গৌরব-অগৌরব, এই রমণীর যশ-অপযশ যে তোমার মায়েরই যশ-অপযশ, এইরূপ চিন্তা করিবে। যাহাতে এই রমণীর মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, যাহাতে এই রমণীর সম্ভ্রম-হানি জন্মে, তাহাতে তোমার মায়েরও যে সম্ভ্রম-হানি ঘটে, এইরূপ চিন্তা করিবে। যদি তোমার নিজ জননীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে, তবে দেখিবে,

এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে অল্পসময় মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তির উপরে তোমার এক অত্যাশ্চর্য্য প্রভুত্ব উপজাত হইয়াছে। অঙ্গুলি-হেলনে ক্রুদ্ধ সমুদ্র-গর্জ্জন নিমেষ-মধ্যে স্তব্ধ হইয়া তোমার অলঙ্ঘনীয় আদেশ পালন করিতেছে, রিপু-কুলের উদ্দাম আক্রমণ দৃক্‌পাত-মাত্র ব্যূহ-ভ্রষ্ট, ছিন্ন-ভিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

অতএব, হে মাতৃভাবের সাধক, মৃন্ময়-কুম্ভবাহিনী বা পল্লী-পথ-বর্ত্তিনী রমণীর মধ্যে তোমার পরমারাধ্যা জননীকে প্রণাম কর,—

নমো জননী, সলিল-বাহিনী,
তৃষ্ণা-কাতর কোটি সন্তান-কণ্ঠে,
শান্তি-অমিয়-দায়িনী।
নমো জননী, নমো শান্তা,
বিশ্ব-পিতার তুমি কান্তা,
পল্লী-পথের তুমি উজ্জ্বল জ্যোৎস্না
মৃদু-মন্থর-গামিনী,
নমো জননী।

নমো নব উল্লাস-দাত্রী,
তুমি চির-মঙ্গল ধাত্রী,
অশুভ বিমর্দ্দিনী, কল্যাণ বর্দ্ধিনী,
মন্মথ-মোহ-বারিণী,
নমো জননী।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

হে মাতৃভাবের সাধক, বিশ্রব্ধ আলাপন-নিরতা ক্ষণ-বিশ্রাম-প্রয়াসিনী রমণী-মূর্ত্তির মধ্যে তোমার পরমারাধ্যা জননীকে প্রণাম কর,—

প্রণাম তোমার চরণে,
দীন সন্তান চাহে মা অভয়
জীবনে কিম্বা মরণে ॥
বিশ্রাম তোর সাজে না জননী
সন্তান চাহে বর,
সন্তান চাহে—অসুর-মুণ্ড,
করযুগে খর্পর।
সন্তান চাহে—বিপুল শক্তি
শত্রুর সংহরণে।
প্রণাম তোমার চরণে ॥

কাম-ক্রোধ-রূপী বিষ-ভুজঙ্গ
দংশিছে মোরে নিত্য,
রিপুকুল উদ্‌ভ্রান্ত করিল
দুর্ব্বল মম চিত্ত,
অশিব হরিল ছলনা করিয়া
সঞ্চিত যত বিত্ত
(আমি) অক্ষম সম্বরণে,
প্রণাম তোমার চরণে ॥

মাতৃভাবের সাধনা

আয় মা আজিকে রণ-রঙ্গিণী
প্রলয়ঙ্করী সাজে
ধ্বংস করিয়া ধ্বংসের বীজে
হৃদয়-শ্মশান-মাঝে,
মৃত্যুর মাঝে জাগুক সৃষ্টি
নূতন সবুজ বরণে,
প্রণাম তোমার চরণে।

হে মাতৃভাবের সাধক, স্নানরতা সিক্ত-বসনা অর্দ্ধাবরণা রমণী-মূর্ত্তির মধ্যে তোমার পরমারাধ্য জননীকে প্রণাম কর।

প্রণাম করিতে যোগ্য নহিক,
তথাপি প্রণাম লও,
আমি দীনহীন, আমি অক্ষম,
তুমি দীনহীনা নও!

আর্দ্র বসনে দাঁড়িয়ে রয়েছ
বস্ত্র পরাতে চাই,
খুঁজিয়া দেখিনু নিখিল বিশ্বে
বস্ত্র কোথাও নাই।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

বস্ত্র-বিহীনা জননী, হায়রে
লজ্জা কেমনে সও,
তথাপি প্রণাম লও,
তথাপি প্রণাম লও গো জননী
তথাপি প্রণাম লও।
আমি দুর্ভাগা, আমি নরাধম,
তুমি দুর্ভাগা নও!

আপনার হাতে পুণ্য বসন
পারিনি রচিতে হায়,
তাই না পথিক তোমাকে দেখিয়া
টিট্‌কারী দিয়া যায়!
তাই না জননী আনত-নয়নে
মৌনে দাঁড়ায়ে রও?
তথাপি প্রণাম লও।

তথাপি প্রণাম লও গো জননী
তথাপি প্রণাম লও।
আমি দুর্ব্বল, আমি অচেতন,
তুমি দুর্ব্বলা নও!

মাতৃভাবের সাধনা

শক্তি জাগাও অন্তরে মোর
পুণ্য প্রভাবে যার,
নিমেষের মাঝে ক্ষুদ্র লালসা
হয়ে যায় ছারখার।

জাগাও তেমন তীব্র চেতনা
ঘুচাইতে পারি তোমার বেদনা,
ধ্বংস করহ বিলাস-বাসনা
আমারি মা যদি হও,
জননী, প্রণাম লও।

হৃদয়-সাগর-মন্থন-করা
ভক্তি-প্রণাম লও,
আমি অভাজন, আমি অযোগ্য,
তুমি অযোগ্যা নও।

হে মাতৃভাবের সাধক, কুসুম-বনে পুষ্প চয়ন-নিরতা, রমণী-মূর্ত্তি-মধ্যে তোমার পরমারাধ্যা জননীকে প্রণাম কর,—

প্রণাম করি পায়ে,
প্রণাম করি প্রাণে, মনে,
হৃদয়-বাক্য-কায়ে।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

শিবের পূজা করিস্ মা তুই
আমার শুভের লাগি,
তাই কি মা তুই তুলিস্ পুষ্প
সবার আগে জাগি ?
তাই কি মা তুই সাজি নিয়ে
কুঞ্জ-বনচ্ছায়ে ?
প্রণাম করি পায়ে।

ধন্য মা তোর স্নেহ,
ধন্য মা তোর হৃদয়-নিলয়
গভীর স্নেহের গেহ,
ফুট্‌ল মা তোর বৎসলতা
কোন্ মলয়ের বায়ে ?
প্রণাম করি পায়ে।

হে মাতৃভাবের সাধক! বাতায়ন-পথে সন্তানাগমন-প্রতীক্ষমাণা রমণীর মূর্ত্তি-মধ্যে তোমার পরমারাধ্য জননীকে প্রণাম কর,—

চরণে নমস্কার।
সন্তান-শুভ-কাঙ্ক্ষিণী মাতঃ
প্রণমি বারংবার।

মাতৃভাবের সাধনা

কোন্ সুদূরের বনানী-গহনে
সন্তান চলে পথ,
কোন্ সুদূরের কর্ম্ম-আহবে
চালায় সে রণ-রথ,
প্রতীক্ষা কি গো করিছ জননী
আগমন-আশে তার ?
চরণে নমস্কার।

কোন্ সুদূরের সাগর ঊর্ম্মি
দলি' চরণের তলে
ভীম-বিক্রমে বাহিছে তরণী
তব আশিসেরই বলে,
সংগ্রহ সে কি করিছে জননী
মণি-মুকুতার হার ?
চরণে নমস্কার।

সন্তান যদি বিদেশেও থাকে,
তোমারি আশীর্ব্বাদ
রক্ষা তাহারে করিছে নিত্য
কেন মা তবে বিষাদ ?

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

তোমারি লাগিয়া আহরিছে সে যে
গৌরব-সম্ভার।
চরণে নমস্কার।

হে মাতৃভাবের সাধক, ভিক্ষা-করঙ্ক-ধারিণী, গৃহ হইতে গৃহান্তর-গামিনী রমণী মূর্তি-মধ্যে তোমার পরমারাধ্যা জননীকে প্রণাম কর,—

হায় জননী, অশ্রুরাণী
ভিক্ষাপাত্র দে ফেলে,
প্রণাম করে চরণ ধ'রে
তোর এ নরাধম ছেলে।
থাকতে মোরা জন্মজোড়া
দুঃখ রাশি সইবি হায়,
আর ত এমন হ'তেই কখন
দিব না প্রাণ যদিও যায়;
মোর সাধনা—তোর বেদনা
ঘুচাব জীবন জেলে।
তোর সেবাতে দিবস-রাতে
করব সকল সমর্পণ,
ক্ষুদ্র বৃহৎ ছোট্ট-মহৎ
যা কিছু মোর হয় আপন,
তোর চরণে ফুল্ল মনে
দিব গো মা সব ঢেলে।

মাতৃভাবের সাধনা

সঙ্কল্প কর :—

সবার মুখে দেখ্‌বো আমি
আমার মায়ের মুখ্‌খানি,
সবার কথায় শুনব আমি
আমার মায়ের মধুর বাণী।

ভুলাস্‌নে মা কামের ছলায়,
ডুবাস্‌নে মা মায়া-দরিয়ায়,
প্রাণ জুড়ে মোর থাকে যেন
তোরই অভয় পা-দু'খানি।

তুই যে সকল জগৎ-জোড়া
সকল নারী সকল নর,
তুই যে আমার জীবন-ভরা
সকল আপন সকল পর,
এই কথা বিস্মরি' যেন
কুড়াই না নরকের গ্লানি।

প্রার্থনা কর :—

মা হ'য়ে তুই আয়,
মা হ'য়ে তুই আয়,
চিত্ত যেন তোর পরশে
তৃপ্ত হ'য়ে যায়।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

চাইতে যেন মুখের পানে
নয়ন ভাসে অশ্রু-বানে,
ললাট যেন লোটে মা তোর
ঐ চরণ তলায়।
মা হ'য়ে তুই আয়।

শুনতে যেন কণ্ঠ-বাণী
নেচে অধীর হয় পরাণি
হৃদয় যেন স্নেহের কোলে
নূতন জীবন পায়,
মা হ'য়ে তুই আয়।

ইহাই স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব অর্জ্জনের পরমোৎকৃষ্ট সাধন।

———

**"জগতের প্রত্যেক রমণী
তোমার জননী।"**

—স্বরূপানন্দ—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্জ্জুনের মাতৃভাব

জীবনে এমন অনেক প্রলোভন আসে, যাহার সমক্ষে পড়িলে মাতৃভাব রক্ষা করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে। কুন্তী-পুত্র অর্জ্জুন এক সময়ে এইরূপ এক প্রলোভনের সমক্ষে পড়িয়াছিলেন।

নিবাত-কবচ নামক দুর্দ্ধর্ষ দানবকে সংহার করিবার জন্য এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনকে ভূতল হইতে স্বর্গ-লোকে আনয়ন করান। অমরাপুরীতে প্রবেশ কালে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ দিব্য গীত-নিনাদে অর্জ্জুনকে স্তুতি করিতে লাগিল, কুসুম-সৌরভান্বিত পবিত্র পবন তাঁহাকে অনুবীজিত করিতে লাগিলেন, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অশেষ আশীর্ব্বাক্যে মহাবাহু অর্জ্জুনের সংকার করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় জন্মদাতা পিতা দেবরাজকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন এবং শিরোনমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। দেব-রাজ ইন্দ্র দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অর্জ্জুনের হস্ত ধারণ করিয়া দেবর্ষিগণ-সেবিত ইন্দ্রসভায় পবিত্র ইন্দ্রাসনে নিজ পার্শ্বে উপবেশিত করাইলেন। সামগান-বিশারদ তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ পরম মনোরম সামগাথা গাহিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনের সম্মানার্থে ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী, চিত্রলেখা প্রভৃতি

সহস্র সহস্র রূপ-যৌবন-শালিনী কমল-নয়না স্বর্গনর্ত্তকীবৃন্দ সভাস্থগণের মন, চিত্ত ও বুদ্ধি হরণ-পূর্ব্বক হাবভাবময়ী নৃত্যলীলা বিস্তার করিতে লাগিল।

নৃত্য-কলা দর্শন করিতে করিতে মহাবীর অর্জ্জুন উর্ব্বশীর নৃত্য-কুশলতায় অতিমাত্র বিমুগ্ধ হইলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসায় অবগত হইলেন ইনি উর্ব্বশী, স্বর্গ-নর্ত্তকীগণের প্রধানা। পরিচয় পাইয়া অর্জ্জুন বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৃত্তাকারে পরিভ্রাম্যমাণা উর্ব্বশীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নয়ন পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"এই কি সেই মহীয়সী নারী, যিনি পৌরব-বংশের আদি জননী? এই কি সেই অসামান্যা রমণী, যিনি আমার আদি পুরুষের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিলেন, ফলে বীরেন্দ্রবৃন্দের উৎপাদক মহাশৌর্য্যবীর্য্যশালী এই মহদ্বংশের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল?" স্বীয় বংশের আদি জননীকে বার্দ্ধক্য-ক্লিষ্টা জরতীদশাপন্না নিরীক্ষণ না করিয়া আজও ষোড়শী যুবতীর ন্যায় নিটোল স্বাস্থ্যবতী, অটুট লাবণ্য-সম্পন্না ও অপূর্ব্ব স্থির-যৌবনা সন্দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অর্জ্জুন প্রশংসমানা দৃষ্টিতে উর্ব্বশীকে বারংবার দর্শন করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অলক্ষ্যে ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং অর্জ্জুনকে উর্ব্বশীর প্রতি প্রণয়াসক্ত বলিয়া অনুমান করিলেন।

অনন্তর একদা দেবরাজ ইন্দ্র গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে

নির্জ্জনে কহিলেন,—"হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি অদ্য মৎ-প্রেরিত হইয়া অপ্সরা-প্রধানা উর্ব্বশীর নিকটে গমন কর,—উর্ব্বশী যেন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে রতিসুখ প্রদান করে।"

দেবরাজ গন্ধর্ব্বরাজকে এইরূপ কহিলে, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন তাঁহার আদেশানুসারে অপ্সরোবরেণ্যা উর্ব্বশীর সমীপে উপনীত হইলেন এবং ইন্দ্রাদেশ ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন,—"হে সুশ্রোণি! শ্রবণ কর, সুরলোকের একচ্ছত্র অধিপতি ইন্দ্র তোমার প্রসন্নতায় অভিনন্দন করিয়া থাকেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিলাম। সেই বীরবর অর্জ্জুনকে তুমিও অবগত আছ, যিনি সৌভাগ্য, রূপবত্তা, চরিত্র-বল ও বীর্য্যের জন্য বিখ্যাত, যিনি মহাযশস্বী, সদ্বংশজাত, প্রিয়বাদী ও ত্রিলোক-পূজিত, যিনি সুবক্তা, লোকমনোহর ও সর্ব্বজনপ্রিয়। হে কল্যাণি! দেবরাজের ইচ্ছা, সেই নিখিল গুণগ্রামবিভূষিত অর্জ্জুন যাহাতে অদ্য তোমার শরণাপন্ন হইয়া ত্বদীয় চরণযুগল প্রাপ্ত হন, তাহা কর।

অনিন্দিতা উর্ব্বশী চিত্রসেনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করতঃ প্রীতচিত্তে কহিল,—"হে সাধো! তুমি আমার নিকট সেই পুরুষ-প্রবর অর্জ্জুনের যে গুণানুবাদ করিলে, তাহা শুনিয়াই আমার মন মন্মথ-বাণে ব্যথিত হইয়াছে, অতএব, আমি কি জন্য তাহাকে বরণ না করিব?

সম্প্রতি দেবরাজের আজ্ঞা, তোমার সহিত প্রণয় এবং মহাবীর অর্জ্জুনের গুণাবলীতে আমার অন্তঃকরণে কন্দর্পের উদয় হইয়াছে ; অতএব তুমি যথাভিলষিত স্থানে গমন কর, আমি অর্জ্জুনের নিকট আনন্দ সহকারে উপনীতা হইব।"

অতঃপর উর্ব্বশী অর্জুন-কামনায় অত্যন্ত অভিলাষিণী হইয়া স্নানক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বহুবিধ সুপ্রভান্বিত অলঙ্কার ও গন্ধ-মাল্য পরিধান করিল এবং প্রদোষ-সময়ে প্রগাঢ় চন্দ্রোদয় হইলে স্বীয় আলয় হইতে নির্গমন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের ভবনোদ্দেশ্যে গমন করিতে লাগিল। কুসুম-স্তবক-ভূষিত সুকুঞ্চিত দীর্ঘ কেশপাশে শোভমানা প্রিয়দর্শনা সেই বরাঙ্গনা স্বচ্ছ সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয়খণ্ড পরিধান করিয়া স্বল্পপরিমিত মদিরাপানে সানন্দভাবযুক্তা এবং মন্মথাবির্ভাবে হাবভাবময়ী হইয়া পবনতুল্য দ্রুতগতিতে হাস্যবদনে ক্ষণ-কালের মধ্যে অর্জ্জুন-ভবনে উপনীতা হইল।

অর্জ্জুন রাত্রি কালে নিজ নিকেতনে উর্ব্বশীকে দেখিবামাত্র সশঙ্ক-চিত্তে তাহার নিকট প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন এবং লজ্জাবৃত-লোচনে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক গুরুর ন্যায় পূজা করিলেন এবং কহিলেন,—"হে দেবি, অপ্সরঃ-প্রধানে, আপনাকে আমি মস্তক দ্বারা অভিনন্দন করিতেছি, আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন, আজ্ঞা করুন ; আমি আপনার আদেশ-পালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত।"

উর্ব্বশী অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে একান্ত হৃষ্টচিত্তা হইয়া কহিতে লাগিল,—"হে মনুজোত্তম, তোমার আগমন-জন্য স্বর্গে যে মনোরম মহোৎসব-সভা হইয়াছিল, যাহাতে গন্ধর্ব্বগণ মনোরম বীণাবাদ্য ও মনোরম দিব্য সঙ্গীত করিয়াছিল, এবং প্রধান প্রধান অপ্সরোগণ নৃত্যলীলায় প্রমত্ত হইয়াছিল, তুমি সেই সভায় অন্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমাকেই অনিমেষ-নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে। তাই, সুরপতি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি অনঙ্গের বশতাপন্ন হইয়াছি, তোমার গুণগ্রামে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, অতএব তোমার সুখ-সম্পাদন করা আমারও চিরাভিলষিত মনোরথ।"

অর্জ্জুন উর্ব্বশীর এই কথা শ্রবণ করতঃ সাতিশয় লজ্জিত হইয়া হস্তদ্বয়ে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে বরাননে, আপনি যাহা আমাকে বলিলেন, তাহা আমার দুঃশ্রোতব্য, কারণ, আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুপত্নী-তুল্যা। দেব সভায় আমি যে আপনাকে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ আপনাকে সত্য-রূপে বলিতেছি। এই দেবাঙ্গনাই পৌরব বংশের আদি জননী, এই ভাবিয়া প্রফুল্ল নয়নে শঙ্কিত দৃষ্টিতে আপনাকে দর্শন করিয়াছিলাম। আপনি আমার বংশ-বৰ্দ্ধিনী, সুতরাং আমার গুরু অপেক্ষাও গুরুতরা,—আপনি আমার প্রতি অন্য ভাব পোষণ করিবেন না।"

উর্ব্বশী কহিল,—"হে ইন্দ্রসুত অর্জ্জুন, আমরা স্বর্গীয় অপ্সরারা কাহারও আবৃতা নহি, অতএব আমাকে গুরুস্থানে নিযুক্তা করা তোমার উচিত হয় না। পুরু-রাজার বংশে যে সকল পুত্র বা পৌত্র তপস্যার ফলে এই স্বর্গপুরে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন। অতএব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি মন্মথানলে সন্তপ্তা ও পীড়িতা হইয়াছি, আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হয় না। আমি তোমার ভক্ত, আমাকে ভজনা কর।"

অর্জ্জুন কহিলেন,—"হে জননী, আপনি শ্রবণ করুন এবং দিগ্‌বিদিক্ ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও শ্রবণ করুন। আমার পক্ষে গর্ভধারিণী কুন্তী, বিমাতা মাদ্রী এবং ইন্দ্রপত্নী শচী-দেবী যে প্রকার গরীয়সী, আমার বংশ-জননী আপনিও তদ্রূপ গরীয়সী। মিনতি করি, আপনি এস্থান হইতে প্রস্থান করুন, আমি নতশিরে আপনার চরণদ্বয়ে প্রপন্ন হইতেছি। আপনি আমার মাতৃবৎ পূজ্যা, অতএব, আমাকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য।"

প্রত্যাখ্যাতা উর্ব্বশী অর্জ্জুন-বাক্য শ্রবণে ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে ভ্রূকুটি-কুটিল-নেত্রে দৃষ্টিপাত করতঃ ধনঞ্জয়ের প্রতি এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল,—"হে পার্থ! আমি তোমার পিতা দেবরাজ ইন্দ্রের অনুজ্ঞা-হেতু উপযাচিকা হইয়া তোমার

গৃহে আসিতেছি, বিশেষতঃ আমি কন্দর্পের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি, এমতস্থলে তুমি আমাকে অভিনন্দিত করিলে না। অতএব তুমি পুরুষত্বহীন বলিয়া বিখ্যাত এবং নর্ত্তক হইয়া ক্লীবের ন্যায় স্ত্রীগণ-মধ্যে বিচরণ করিবে।”

উর্ব্বশী ওষ্ঠ কম্পন পূর্ব্বক এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অনন্তর অর্জ্জুন ত্বরায় চিত্রসেনের সমীপে গমন করিয়া উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। চিত্রসেন দেবরাজকে যাবতীয় বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিজ তনয় অর্জ্জুনকে নির্জ্জনে আনাইয়া শুভবাক্যে সান্ত্বনা করতঃ হাস্যমুখে কহিলেন,—“হে বৎস, তোমার জননী কুন্তী তোমাকে পুত্র পাইয়া রত্নগর্ভা হইলেন। হে সত্তম, ঋষিগণও তোমার ধৈর্য্যের দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন, হে মানদ, উর্ব্বশী তোমাকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে, তাহা তোমার পক্ষে কল্যাণ-সাধক হইবে। যখন তোমার দ্বাদশ বর্ষ বনবাসান্তে ত্রয়োদশ বর্ষে শত্রুলোচনের অতীতে রহিয়া অজ্ঞাতবাস করিবে, তখনই তুমি উর্ব্বশীর ঐ অভিশাপ ভোগ করিবে। ঐ সময়ে তুমি নপুংসক-রূপে নর্ত্তকবেশে বিহার করিয়া বৎসরান্তে পুনরায় লুপ্ত পৌরুষ লাভ করিবে। তোমার ন্যায় মহৌজস পুরুষ অজ্ঞাতবাসেও সহজে নিজ শক্তি ও পরিচয় গোপন করিয়া

রাখিতে সমর্থ হয় না, উর্ব্বশীর অভিশাপ * তোমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করিবে।"

বীরবর অর্জ্জুন ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং উর্ব্বশীর শাপজন্য প্রবল দুশ্চিন্তাকে অন্তর হইতে দূর করিয়া দিলেন। আত্মসংযম রক্ষার্থে উপযাচিকা প্রত্যাখ্যান করিলে যদি বিপদ ঘটে, সে বিপদ প্রকারান্তরে এরূপই বান্ধবের কাজ করে।

মহাভারতকার ব্যাসদেব এই অর্জ্জুনোর্ব্বশী-সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি পাণ্ডুপুত্রের এই পবিত্র চরিত্র নিয়ত শ্রবণ করে, তাহার অভিলাষ পাপকর কামে প্রবৃত্ত হয় না।"

ভাবিয়া দেখ, অর্জ্জুন কেমন প্রলোভনের সমক্ষে পড়িয়াছিলেন। অনবদ্যাঙ্গী রূপসী, ইন্দ্রাদি দেবগণও নিরন্তর শ্লাঘার সহিত যাহার সাহচর্য্য কামনা করেন, চিত্রসেনের ন্যায় বহুজন-পূজিত একজন গন্ধর্ব্বরাজ যাইয়া স্বয়ং সানুনয় অনুরোধ করিলে তবে সে ইন্দ্রতনয়ের প্রতি অভিলাষিণী হয়, এমন একজন অতি দুর্লভা রমণী অর্জ্জুনের সকাশে সমুপস্থিতা,—অথচ অর্জ্জুন হিমগিরির ন্যায় অটল, অচল নির্ব্বিকার। পদপ্রান্ত হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত যাহার

---

* মহাভারত। বনপর্ব্ব। দ্বিচত্বারিংশ হইতে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত।

সৌন্দর্য্যের লীলায়িত তরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতেছে, নয়নে যাহার মর্ম্মভেদী কটাক্ষ, অধরে যাহার মধুচ্ছন্দী বাণী, কণ্ঠে যাহার বীণানিন্দী কাকলী, সমগ্র দেহে যাহার চিরস্থির নিটোল যৌবন, রূপের জ্যোৎস্নায় যাহার সমগ্র অস্তিত্ব উদ্‌ভাসিত,— সে আজ প্রেম-ভিখারিণী হইয়া কৃপাপ্রার্থিনী হইয়া অর্জ্জুনের শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মানা, একটু ইঙ্গিত করিলেই তাহার দেহলতা অর্জ্জুনরূপী মহামহীরুহকে আশ্রয় করিতে প্রস্তুত, অথচ অর্জ্জুন ভাস্কর-নির্ম্মিত পাষাণ-প্রতিমার মত হৃদয়হীন, অনুভূতিহীন, অনুরাগবর্জ্জিত। কি আশ্চর্য্য সংযম। গভীরা রজনী, একাকিনী অপ্সরোত্তমা স্বকীয় জীবন-যৌবন প্রেম-পাত্রের পদতলে লুণ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য ব্যাকুলান্তঃকরণে অপেক্ষমাণা, দেহভাণ্ডারের সকল ভোগৈশ্বর্য্য একেবারে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিবার জন্য সে উন্মুখিনী, কেহ নাই বাধা দিবার, কেহ নাই অপযশ প্রচার করিবার, অথচ অর্জ্জুন,—নিঃস্পৃহ, নিষ্কাম, নির্লালস। এই অপূর্ব্ব সংযম অর্জ্জুন কোথায় পাইলেন? এই অসামান্য ধৈর্য্য তাহাকে কে দান করিল?

যে দান করিল, তাহার নাম মাতৃভাব। মাতৃভাবের সাধন করিয়াই রণদুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন কাম-দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। মাতৃভাবের সাধন করিয়াছিলেন বলিয়াই অর্জ্জুন লোভনীয়া নারীতে নির্লোভ, কামনীয়া নারীতে নিষ্কাম রহিতে পারিয়াছিলেন! মাতৃভাবের সাধন করিয়াছিলেন বলিয়াই বিকারের প্রবলতম

হেতু সমক্ষে বিদ্যমান থাকিতেও অর্জ্জুন নির্বিকার রহিতে পারিয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস যথার্থই বলিয়াছিলেন,—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।"

অর্থাৎ, বিকারের কারণ থাকিতেও যাহাদের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, তাহারাই প্রকৃত ধীর ও সংযমী।

অর্জ্জুনের ন্যায় তুমিও হইতে পার। তুমিও তাহার ন্যায় দুস্তর প্রলোভনবারিধি অনায়াসে অতিক্রম করিতে পার, তুমিও প্রলোভনের দুর্ব্বার আকর্ষণজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় নির্ভয়ে উন্মুক্ত গগনে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পার। অর্জ্জুনকে যাহা বল দিয়াছিল, তোমাকেও তাহা বল দিবে, তোমার হৃদয়েও তাহা অপরিমেয় শক্তির সঞ্চয় করিবে, তোমার অন্তরেও তাহা অটল ধৈর্য্য, অবিকার্য্য সংযম প্রতিষ্ঠিত করিবে।

শঙ্কানাশিনী মায়ের ছেলেরা
কাউকে করে না ভয়,
মদন-ধনুর ঘন-টঙ্কারে
অটল, শান্ত রয়।

রতি মদনের ভ্রূকুটি হেরিয়া
তিলেকের তরে চাহে না ফিরিয়া,
গ্রাহ্য করে না আছে কি না আছে
দুরন্ত রিপুচয়।

আপন লক্ষ্যে ছুটি চলি' যায়,
বজ্র গরজে চরণ-তলায়,
হুঙ্কারি' উঠি নিঃশ্বাস-বায়ু
ঝঞ্ঝা-গমনে বয়।

এ জগতে তোমার আর ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের? ছেলে হও, রমণীর জাতি তোমার জননী হইবেন,—ভয় দূর হইবে।

মায়ের ছেলের ভয় কি রে?
কোন্ দিকে কোন্ আস্ছে বিপদ
সে কিরে আর চায় ফিরে?
দিন-রজনী সকল সময়
মায়ের কাজেই ব্যস্ত সে রয়,
পূজায় রত আত্মা যে তার
বিশ্ব-শুভের মন্দিরে।

চতুর্দ্দিকের আকর্ষণে
চিত্ত তাহার অচঞ্চল,
বিপুল সাহস অটল মনে,
বিশ্বাসে সে সমুজ্জ্বল,
বিঘ্ন-বাধা সব কিছুতে
মায়ের আঁখি রয় ঘিরে।

— * —

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কতিপয় আধুনিক দৃষ্টান্ত

অর্জ্জুনও রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন, তুমিও রক্ত-মাংসের মানুষ। রক্ত-মাংসে-গড়া মানব-দেহ-ধারীর নিকটে যেরূপ প্রলোভন আসিতে পারে, অর্জ্জুনের নিকট সেরূপ আসিয়াছিল এবং তিনি মাতৃ শ্রদ্ধার শক্তিতে সে প্রলোভনকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিলেন ; শুধু তাই নয়, বীরেরই মত জয় করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রলোভন তোমারও জীবনে আসিতে পারে এবং অর্জ্জুনের সুমহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তুমিও নিশ্চিতই এই প্রলোভনকে জয় করিতে সমর্থ হইবে।

কিন্তু তোমার সংশয় জন্মিতে পারে যে, অর্জ্জুন দ্বাপর যুগের মানুষ, তখন কলির প্রাদুর্ভাব ছিল না, মানুষের আত্মশক্তির চর্চ্চা অধিক ছিল, আধ্যাত্মিক বলের উৎকর্ষও প্রভূত ছিল, তাই অর্জ্জুনের পক্ষে উর্ব্বশীর অভিসার নিতান্ত নগণ্য ও অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইল। তুমি হয়ত সংশয় করিতে পার যে, এই ঘোর কলিযুগের কোনও মানুষ এত বড় একটা প্রলোভনকে এমন ভাবে পায়ে ঠেলিয়া উঠিতে পারিত না।

কতিপয় আধুনিক দৃষ্টান্ত

কথাটার গোড়াতেই আমি প্রতিবাদ করিব। তোমাদের যে এক ধারণা রহিয়াছে, সত্যযুগের মানুষগুলি সবই একেবারে নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ, আর এই কলিযুগের মানুষগুলি সবই নিতান্ত পাপাসক্ত দুর্ব্বলচেতা,—এ ধারণাটা সম্পূর্ণই ভ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সত্য-ত্রেতাদি যুগেও পাপী ছিল, পর-দার-লোলুপ পাষণ্ড ও ব্যভিচারিণী অসতী ছিল। আবার কলি-যুগেও শুভ্র-চরিত্র সংযত-চেতা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সহস্র সহস্র জন্মগ্রহণ করিয়া ধরিত্রীকে পুণ্যতরা করিয়াছেন।

অত্যন্ত আধুনিক কয়েকটী সত্য ঘটনা দ্বারা আমি আমার বক্তব্য প্রমাণিত করিব। অসংখ্য বালক এবং যুবকের জীবনের মর্ম্মবেদনা-দায়ক নৈতিক অধোগতির দারুণ ইতিহাস আমাকে শ্রবণ করিতে হইয়াছে, অনুতপ্ত কদাচারীর সাশ্রুনয়নের কাতরতায় উপেক্ষা করিতে না পারিয়া যাহা অশ্লীল ও অসুন্দর, এমন অসংখ্য কাহিনীতে কর্ণপাত করিতে হইয়াছে এবং কর্দ্দম ঘাঁটিতে যাইয়া ক্বচিৎ দুই চারিটি পঙ্কজেরও সন্দর্শন আমার মিলিয়াছে। আমি তাহারই দুই একটী তোমাদের চিত্তোৎসাহ-সঞ্জননের জন্য সস্নেহে উপঢৌকন প্রদান করিব। কোনও কোনও স্থলে ঘটনোক্ত ব্যক্তিবর্গ এখনও জীবিত আছেন, তাই, ঘটনার স্থান ও নাম, তাহাদের পরিচয়াদি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রলোভন-জয়ের কয়েকটী সত্য কাহিনী বর্ণনা করিব।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

প্রবোধকুমারের জীবসেবা

ফরিদপুরের অন্তর্গত কোনও এক নগরে মজুমদার-উপাধিক প্রবোধকুমার নামক এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ যুবক বাস করিত। চরিত্র-সম্পদে সে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহাই এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার যে, চরিত্র-রক্ষায় যাহার যত প্রযত্ন, তাহারই সমক্ষে প্রলোভন তত যেন অধিক পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রতিবেশী এক গৃহে জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থ সপরিবারে বাস করিতেন। প্রথমবার পত্নী-বিয়োগের পরে ইনি অধিক বয়সে পুনরায় এক যুবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু ব্যাধি এবং বার্দ্ধক্য বশতঃ ইনি পত্নীর মনোরঞ্জনে সমর্থ হন নাই। নিরাশ্রয়া লতিকার ন্যায় প্রবর্দ্ধমানযৌবনা রমণী ঊর্দ্ধদিকে পরমেশ্বরের পানে মনঃ পরিচালনা না করিয়া ধরিত্রীর মলিন ধুলায় শির লুটাইয়া দিল,—অবৈধ পথে তার অনুরাগ প্রধাবিত হইল। প্রবোধকুমারকে হৃদয়ের অধীশ্বর-রূপে লাভ করিবার জন্য তার লালসাতুর চিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। রমণী জানিত সে রূপবতী, সে সুশিক্ষিতা, অতএব বাক্পটু এবং পুরুষ-মনোরঞ্জনে সে সু-সমর্থা, কিন্তু ইহাও জানিত যে, প্রতিবেশী প্রবোধকুমার চরিত্রবান্ যুবক, তাহার হৃদয় সহজে জয় করা সম্ভব হইবে না।

অতএব, রমণী এক কৌশল অবলম্বন করিল। রমণী শুনিয়াছিল, প্রবোধকুমার এক সেবা-সমিতি গঠন করিয়া স্থানীয় অপরাপর যুবকদের সহিত মিলিত হইয়া রোগীর শুশ্রূষা, আর্ত্তসংকার প্রভৃতি করিয়া থাকে। অতএব রমণী রোগের ভাণ করিল। স্বামী হরনাথ চিকিৎসার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু নিজে বিষয় কার্য্যাদিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন বলিয়া স্বয়ং শুশ্রূষাদি যথোচিত ভাবে করিতে পারেন না। দাস-দাসীর-দ্বারাও শুশ্রূষা উপযুক্ত ভাবে চলে না, যেহেতু অশিক্ষিত দাস-দাসীর সেবায় রমণীর বিরক্তিরই কারণ ঘটিয়া থাকে। রমণী স্বামীর নিকট নিয়তই নিজ পাঠ্য জীবনের শুশ্রূষা-শিক্ষার কথা বলে, আর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্রন্দন করে যে, আসন্ন মৃত্যুকালে রুগ্নশয্যা-পার্শ্বে এমন একটা লোকও তার কপালে জুটিল না, যে সত্যি সত্যি শুশ্রূষা জানে।

হরনাথ বিব্রত হইলেন। পাশ-করা নার্স বহু অর্থ ব্যয়ে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মপত্নী বিধর্ম্মী নারীর হস্ত স্পৃষ্ট ঔষধ সেবন করিতে প্রস্তুত নহে, যদিও ডাক্তারখানায় যে জাতিতেই এই ঔষধগুলি মিশ্রণ করিয়া থাকুন না কেন, তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। নার্স বিদায় হইল। অগত্যা হরনাথ প্রবোধকুমারের সেবা-সমিতির শরণাপন্ন হইলেন। প্রবোধকুমার অল্প-বয়স্ক কয়েকটি শুশ্রূষা-দক্ষ বালক প্রেরণ করিয়া রোগ-ভাণা রমণীর সেবা পর্য্যায়ক্রমে করাইতে লাগিল।

রমণীর আশা পূর্ণ হইল না সত্য, কিন্তু সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠতা-সৃষ্টির সে একটা সূত্র পাইল। শুশ্রূষাকারী বালকগণের নিকট রমণী নিয়ত প্রবোধকুমারের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিত এবং শতকণ্ঠে প্রবোধকুমারের উদ্দেশ্যে প্রশংসমান কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিত। মাঝে মাঝে রমণী প্রবোধকুমারের সেবা-সমিতির সাহায্যের জন্য দুই চারিটি রৌপ্য মুদ্রা এই বালকদের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রেরণ করিত। প্রশংসা বড় বিষম জিনিষ, কেহ কাহারও প্রশংসা করিতেছে জানিলে স্তূয়মান ব্যক্তির মনে স্বতঃই স্তুতিকারীকে দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া থাকে। প্রবোধকুমারেরও তাহাই হইল। যত নির্দ্দোষ উদ্দেশ্যই হউক, অর্জ্জুন যেমন দেবরাজ-সভায় বারংবার অনিমেষ নেত্রে উর্ব্বশীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে জীবনের ভয়ঙ্করতম প্রলোভনকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, প্রবোধকুমারও রুগ্ন এই রমণীকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া নিজেরই অজ্ঞাতসারে এক অতি অবাঞ্ছনীয় লালসার জালে আবদ্ধ হইল। শুশ্রূষার সুশৃঙ্খলা-বিধানের ব্যপদেশে গুরুতর কারণ ব্যতীতই সে একদিন হরনাথের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং হরনাথ-পত্নীর মনোলোভা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অন্তরে এক অভিনব পরিবর্ত্তন অনুভব করিল। প্রবোধকুমার দেখিল, স্বর্ণময়ী প্রতিমায়

যেন অনাদরে মরিচা ধরিয়াছে, দেবীবিগ্রহ পূজারীর অভাবে যেন জীর্ণ-মন্দির-মধ্যে নিরাভরণা ও নিরানন্দা।

প্রবোধকুমারের প্রাণে বাজিল। এই একটা রমণী যেন মূর্ত্তিমান্ প্রতিবাদরূপে তার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং তরুণী কন্যাকে বৃদ্ধের সহিত বিবাহ-দানরূপ কু-প্রথার বিরুদ্ধে সহস্র সারবান্ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বর্ত্তমান সমাজের স্থবির ও জড়বুদ্ধি সমাজপতিদের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক শাসনসূচক অঙ্গুলী-হেলন করিতে লাগিল। রুগ্ন-সেবক প্রবোধকুমারের চিত্ত কয়েকটা মিনিটের মধ্যে যেন এই রমণীর প্রতি সহানুভূতিতে বিগলিত হইতে লাগিল এবং বিরাট এক সমাজ-সংস্কারকের উচ্চ বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া যেন সে নিখিল ভারতে বিবাহের বয়স নির্ণায়ক এক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। হায়রে সহানুভূতি, আর, হায়রে সমাজ-সংস্কার! প্রবোধকুমার যদি জানিত, তাহার ক্ষেত্রে ইহারা প্রচ্ছন্ন কাম ছাড়া আর কিছুই নয়!

কিন্তু প্রবোধকুমার রুগ্না রমণীর সহিত আর ঘনিষ্ঠতা-বর্দ্ধনে চেষ্টিত হইল না, তাহার নিত্য-কর্ত্তব্য সে নিয়মিত ভাবে করিয়া যাইতে লাগিল, দুঃখিনী রমণীর কথা মাঝে মাঝে দুই একবার তাহার মনে পড়িত, সহস্র কর্ম্মের তাড়নায় সে আবার তাহা বিস্মৃতও হইত। কিন্তু কৌশলবতী রমণী এবার আর এক পন্থার আশ্রয় লইল। করুণ স্বরে হরনাথকে জানাইল

যে, এমন আদর্শ-চরিত্র স্বামী সে বহুজন্মের পুণ্যফলে পাইয়াছে, কিন্তু হায়, কাল-ব্যাধির এ সৌভাগ্য সহিল না, তাই তাহাকে জীবনের কোনও সাধ পূর্ণ না হইতেই অকালে ইহধাম হইতে অপসারিত করিবার জন্য আসিয়াছে। বৃদ্ধ হরনাথ পত্নীর এই বাক্য শ্রবণে সোহাগে গলিয়া গেলেন এবং শোকে কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরনাথ-পত্নী বলিতে লাগিল,—এখন আমার শেষ অবলম্বন ভগবান্, সেই ভগবানের কথা শুনাইবার জন্য যদি একটু ব্যবস্থা করিতে পার, তবেই আমার তৃপ্তি হয়। শুনিয়াছি, আমাদের প্রতিবেশী প্রবোধকুমার বড়ই ধর্ম্মানুরক্ত। তিনি কি প্রতিদিন একটু একটু করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা আমাকে শুনাইতে পারেন না?

পত্নীর শেষ অভিলাষ পূরণে হরনাথ প্রস্তুত হইলেন। সমগ্র বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া প্রবোধকুমারও এই রুগ্না নারীকে শান্তিদানে উপেক্ষা করা অকর্ত্তব্য বোধ করিল। শাস্ত্র-কথা শুনান আরম্ভ হইল; প্রথম প্রথম শয্যাশায়িনী পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া হরনাথও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন। কিন্তু মুমূর্ষুর ধর্ম্মানুরাগ যত প্রবল থাকে, মরণ-সম্ভাবনা যাহার সন্নিকট নহে, তাহার ধর্ম্মানুরাগ সর্ব্বদা তত প্রবল থাকে না। অতএব, ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন হইল যে, প্রবোধ-কুমার বসিয়া হরনাথ-পত্নীকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেও কেহ তাহাতে কিছু মনে করিবার হেতু পাইত না।

এখন হইতে কিন্তু রমণীর রোগ ক্রমশঃ উপশমের দিকে আসিতে লাগিল। এদিকে নিয়ত ঘনিষ্ঠতার ফলে প্রবোধ-কুমারের অন্তরে নানা সময়ে নানা প্রকার বিক্ষিপ্ত চিন্তাবলী বিজলীর ন্যায় ক্ষণিকে উদিত হইয়া চকিতের মধ্যেই বিলয়-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এমনি সময়ে একদিন রমণী তাহার সযত্নে প্রচ্ছাদিত অভিসারিকা-মূর্ত্তি প্রকাশ করিল। অপ্রত্যাশিত এই উপযাচিকার আবির্ভাবে প্রবোধকুমার বিহ্বল হইয়া পড়িল। রমণীর অনাবৃত বাক্য এবং অসম্বৃত ব্যবহারে সে যেন চেতনা হারাইল। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এক পরম লোভনীয় সুখাস্বাদনের লালসায় তাহার কল্যাণ-বুদ্ধি যেন লোপ পাইতে বসিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে যেন রমণীর করকৃত ক্রীড়নকের ন্যায় যথেচ্ছ পরিচালিত হওয়াই ইহ-পর-জীবনের সর্ব্ব-সুখ-সার বলিয়া মনে করিতে সমুৎসুক হইল।

কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার, প্রাক্তন সাধনা, অতীত দিনের তপস্যা মানুষকে বিষম বিপদের দিনেও অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য করে। সহসা প্রবোধকুমারের মনে হইল, তাহার সেবা সমিতির প্রথম প্রতিজ্ঞা।

স্ত্রীজাতিকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবে, মাতৃবৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, মাতৃবৎ তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে, মাতৃবৎ তাঁহার প্রতি আচরণ করিবে।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

মাতৃস্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ামাত্র প্রবোধকুমারের আলিঙ্গনোদ্যত বাহু যেন শিথিল হইয়া আসিল, সর্ব্বাঙ্গে তপ্ত রক্ত-প্রবাহ যেন শীতল হইয়া আসিল, বাসনার উদ্বেল তরঙ্গ যেন মন্দীভূত হইয়া আসিল। মাতৃস্মৃতি জাগরিত হওয়া মাত্র প্রবোধকুমারের চিত্ত এক অপরিমেয় বিরাগে পূর্ণ হইয়া গেল, চিত্ত-বৃত্তির দুরন্ত ক্ষিপ্ততা প্রশান্ত হইয়া আসিল,—নতজানু হইয়া উভয় করে রমণীর পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া প্রবোধকুমার কহিল,—মা, আপনি পরনারী, আমার জননী, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রক্ষা করুন।

মাতৃ-সম্বোধনের জয় হইল, মাতৃনামের অলঙ্ঘনীয় মহিমা শাশ্বতকালের ন্যায় আজও অভ্রংলিহ উচ্চতায় সমাসীন রহিল, বাসনা-সমুদ্রের ফেন-পঙ্কিল তরঙ্গ আকাশ-চুম্বী হিমাচলের গৌরব ধ্বংস করিতে পারিল না।

ইহার পর কত সুখ ও কত দুঃখের মধ্য দিয়া প্রবোধ-কুমার ও তাহার এই প্রলোভন-লব্ধা মাতার দিন কাটিয়াছে, হরনাথ বিধবা স্ত্রীকে একাকিনী রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, আজও প্রবোধকুমার হরনাথ-পত্নীকে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণ করায়, কিন্তু রমণী আজ ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণী, পবিত্রতার প্রসন্নতা-প্রতিমাস্বরূপিণী, আত্মসংযমে অতুলনীয়া শুদ্ধোজ্জ্বলা মাতৃময়ী পরমারাধ্যা মূরতি।

নিরঞ্জনের অধ্যাপনা

বিক্রমপুরের অন্তর্গত কোনও সম্ভ্রান্ত পল্লীতে বন্দ্যোপাধ্যায়োপাধিক নিরঞ্জন নামক এক ব্রাহ্মণ-তনয় বাস করিতেন। শাক্ত পরিবারের সন্তান, সহজেই সে কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তিমান্ এবং পিতামাতার অনুকরণে দেবী-বিগ্রহের সমক্ষে বসিয়া প্রতিদিন সে কিছুক্ষণ ভগবানকে মাতৃমূর্ত্তিতে আরাধনায় অভ্যস্ত। বয়সে সে নবীন, কৈশোর তাহার অরুণ-বিভায় নিরঞ্জনের স্বভাব-সুন্দর মুখমণ্ডলকে সুন্দরতর করিয়াছে, হৃদয়ভরা তাহার উৎসাহ, প্রাণভরা তাহার উল্লাস, কর্ম্মে তাহার অফুরন্ত সামর্থ্য, সাহসে সে অতুলনীয়। আনন্দের জীবন্ত মূর্ত্তি নিরঞ্জন হাসিয়া খেলিয়া পাঠ্য-জীবনের কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন করিয়া কৃতিত্বের সহিত নিত্য জয়-মুখর জীবন-পথ সগৌরবে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে,— ক্লাসের সে-ই অগ্রণী ছাত্র, খেলার মাঠে সে-ই নেতা।

কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র অভিপ্রায়,—একদিন তাহার শারদ-জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ নির্ম্মল আকাশে মেঘের উদয় হইল। অনূঢ়া কুলীন-কন্যা বিবাহের যোগ্যতা সঞ্চয়ের জন্যই প্রতিবেশী বালক নিরঞ্জনের নিকট পাঠ্য-পুস্তক লইয়া আসিয়া তার ছাত্রী হইল। নিরঞ্জন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত এই বোকা মেয়েটার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিল এবং নিজের পাঠের অবসর সময়ে একটু একটু করিয়া তাহাকে পাঠ দিতে ও

তাহার পাঠ নিতে লাগিল। মাষ্টারী করিতে গেলেই ছাত্র-শাসন একটা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যে গিয়া দাঁড়ায়, অতএব নিরঞ্জনও অবাধে প্রয়োজনে-নিষ্প্রয়োজনে বেচারী বালিকার পৃষ্ঠে উত্তম-মধ্যম প্রদান করিয়া বিদ্যাদান করিতে লাগিল। ছাত্রীর বিদ্যালাভ কিছু হইতে লাগিল বটে, কিন্তু নিরঞ্জনের যাহা লাভ হইতে লাগিল, তাহা হইতেছে বিদ্যাদান ব্যাপারটার উপরে একটা তীব্র বিরক্তি। শেষে একদিন বালক নিরঞ্জন নিতান্ত চটিয়া উঠিয়া ছাত্রীর পুস্তক দূরে ছুড়িয়া রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিল,—"বিয়ের জন্যই ত' লেখাপড়া? কাজ নেই তোর লেখাপড়ার, আমিই তোকে বিয়ে কর্ব্ব, তাহ'লেই আপদ চুকে যাবে।"

ছাত্রী অবশ্য এ প্রস্তাবে খুশী হইল না, সেও রাগ করিয়া গুরুদেবের গৃহ পরিত্যাগ করিল এবং রাগ থামিলে দুই চারিদিন পরে পুনরায় আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। নিরঞ্জনের বন্ধুরা কিন্তু নিরঞ্জনের বিবাহ-প্রস্তাবটাকে হাসি, ঠাট্টা, তামাসা ও বিদ্রূপের ভিতর দিয়া জাগ্রত রাখিতে লাগিল। ছাত্রী ভুলিয়া গেল, কবে তাহার মাষ্টার ক্রোধের বশে কি কথা বলিয়াছে, কিন্তু মাসের পর মাস বন্ধুদের অপ্রীতিকর পরিহাস নিরঞ্জনের মনে সেই খামাখা কথাটাকেই প্রতিনিয়ত প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিল। অমূল তরুতে শাখা-পত্র-পল্লবের উদ্‌গম হইল। নিরঞ্জনের মনে মন্মথের আবির্ভাব

হইল, অনঙ্গ-পীড়ায় নিরঞ্জন অধীর হইয়া পড়িল। হায়রে যৌবন! তিলকে তাল করিবার ক্ষমতা তোমার অপরিসীম!

এখন ছাত্রী অনেকটা বড় হইয়াছে। যে বয়সে অঙ্গের গড়ন বা শরীরের বর্ণের অপেক্ষা না রাখিয়াই দেহের স্বাভাবিক লাবণ্য স্ত্রীমূর্ত্তিকে পরমলোভনীয় করে, ছাত্রীর এখন সেই বয়স। পড়াশুনায়ও সে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, কোন কোন দিন পড়া সারিতে বেশী রাত্রিও হইয়া যায়। নানা স্থান হইতে ছাত্রীর বিবাহের প্রস্তাবও আসিতেছে। এক একটা বিবাহের আলাপ আসে আর নিরঞ্জনের বুকে যেন কে হাতুড়ী পিটিতে থাকে। অনেক কথাবার্ত্তা, অনেক বাদানুবাদ, পাওনা-দেনা লইয়া অনেক তর্কাতর্কির পর যখন পরিশেষে বিবাহ ফিরিয়া যায়, নিরঞ্জন তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

কিন্তু এভাবে আর ক'দিন থাকা যায়? একদিন নিরঞ্জন ছাত্রীর নিকটে তার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিল।

—ছাত্রী কোনও কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে পুঁথি পুস্তক গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিরঞ্জন অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া বলিল,—যাইও না, দাঁড়াও, আমার একটা কথা শুনিয়া যাও, আমি আর্ত্ত, আমি শরণাপন্ন, আমি কৃপা-ভিখারী!

অনাঘ্রাতা কুমারীর পবিত্র মুখমণ্ডলে দৃঢ়তার তেজ সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তাতে কোনও পরুষ ভাব নাই। অপলক নেত্রে নিরঞ্জনের দিকে তাকাইয়া মৃদু ভৎসনার কণ্ঠে ছাত্রী কহিল,—ছিঃ, এই জন্যই তুমি আমাকে এতদিন পড়াইয়াছিলে? তোমার কি মা বোন নাই?

কি বলিলে? মা-বোন নাই? অন্য কথা পাইলে না, শেষে মায়ের কথা তুলিলে? নিরঞ্জনের মাতৃ-বিবেকে কিসের যেন এক সুতীক্ষ্ণ খোঁচা মর্ম্মস্থানকে বিদ্ধ করিল। নিদারুণ আঘাতে নিপীড়িত হইয়া শিরে হাত দিয়া নিরঞ্জন বসিয়া পড়িল।

সেদিন হইতে নিরঞ্জন তার কল্পনা-লোকের ক্ষণিক সুখের প্রণয়-স্বপ্ন ভুলিয়া যাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে আরম্ভ করিল। আশাহীন বক্ষ তার গুমরিয়া কাঁদিয়া মরে, কাহার কাছে গিয়া সে তার প্রাণের ব্যথা জুড়াইবে, কে সে দরদের দরদী, যাহার কাছে হৃদয়-বেদনা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া সে তাহার পূর্ব্বতন আনন্দময় কলহাস্যমুখরিত নিত্য-জয়-গৌরবান্বিত হারানো জীবনকে ফিরিয়া পাইবে?

প্রতিদিনের অভ্যাস মত কাল-ভয়-বারিণী কালিকা মূর্ত্তির সমক্ষে সে গিয়া বসে, প্রাণ ভরিয়া কাঁদে, আর বলে,—হে মা, জগজ্জননী! কেন এ কুবুদ্ধি দিলি, কেনই-বা হৃৎপিণ্ডে এ শক্তিশেল হানিলি, আমায় পথ দেখা মা, অবসাদের এই

তীব্র অন্ধকার যে ভেদ করিতে পারিতেছি না জননী।

কাঁদিতে কাঁদিতে একদিন তার অন্তরে যেন এক জ্যোতির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কে যেন এক অনবদ্য নিনাদে স্নেহমাখাকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—কাঁদিস্ না বাবা, কাঁদিস্ না, ঐ নারী আর আমি এক, অভিন্ন, অভেদাত্মা! আমিই সূক্ষ্মরূপে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছি, আবার আমিই স্থূলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোর শিষ্যা হইয়া তোর কাছে ইতিহাস শিখিয়াছি, ভূগোল শিখিয়াছি, গণিত শিখিয়াছি, জ্যামিতি শিখিয়াছি। আমিই তোর চিত্ত হরণ করিয়াছি, আবার আমিই তোর ঘুমন্ত প্রাণকে জাগাইবার জন্য তোর মায়ের খোঁটা দিয়াছি। কাঁদিয়া আর বক্ষ ভাসাস্ না বাপ, এই চাহিয়া দেখ আমি কে?

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে মহামায়ার বৈভবশালিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ত্রিভুবন আলো করিয়া ফুটিয়া উঠিল। নিরঞ্জন দেখিল পার্শ্বে তার শিষ্যা দিব্যাভরণে ভূষিতা হইয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যে বিরাজমানা, অপর পার্শ্বে জগন্মাতা আদ্যাশক্তি বরাভয়-করে প্রসন্ন-নেত্রে অবস্থিতা। দেখিতে দেখিতে দুইটি বিগ্রহ একটিতে পরিণত হইয়া যুগপৎ দুইটি মূর্ত্তিরই বিভা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিয়ৎকাল পরে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল, রাখিয়া গেল নিরঞ্জনের জন্য দিব্য এক অভয় আর অপূর্ব্ব এক চিত্ত-প্রশান্তি।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

তারপর নিরঞ্জন কর্ম্মজীবনের কত অবসরে তার প্রাক্তন শিষ্যার সমীপে গমন ও অবস্থান করিয়াছে, কিন্তু বদ্ধমূল মাতৃভাব তাহার অন্তরে চপলতার আর ক্ষুদ্র একটী রেখাপাতও করিতে দেয় নাই!

হিতলালের পার্ব্বতীপূজা

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোনও এক সমৃদ্ধ পল্লীতে এক প্রোষিতভর্ত্তৃকা রমণী বাস করিত। রমণী নব-যৌবনসম্পন্না, সকামা, কিন্তু নিকৃষ্ট ব্যক্তিতে রুচিহীনা। নিজ বংশ-মর্য্যাদার উপযুক্ত এবং নিজ শিক্ষা-দীক্ষায় সমকক্ষ ব্যক্তির অভাবে অনঙ্গ-পীড়াগ্রস্তা হইয়াও রমণী কঠোর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল।

এই সময়ে সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিতলাল নামধেয় এক যুবক স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। হিতলাল নিজ জননীর সহিত বাস করিত এবং জননীকেই সাক্ষাৎ মহাদেবী পরমেশ্বরী জ্ঞান করিত। জননীকেই সে গায়ত্রীর উপাসনাকালে সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া চিন্তা করিত এবং প্রত্যহ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক ও শয়ন-প্রাকালে জননীর চরণ বন্দনা করিত। কোথাও যাইতে হইলে হিতলাল জননীর পাদপদ্মে প্রণাম না করিয়া যাত্রা করিত না এবং জননীর চরণামৃত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সে এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত পান করিত না। জননীই তাহার

ধ্যান, জননীই তাহার জ্ঞান, জননীই তাহার আশা, জননীই তাহার আকাঙ্ক্ষা, এক কথায় জননীই ইহ-পর-জীবনের সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বাবলম্বন ছিল।

এই মাতৃভক্ত হিতলালের উপরে প্রোষিতভর্ত্তৃকা রমণীর লালসা উপজাত হইল। জগতে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, নিতান্ত মন্দেরাও ভাল জিনিষটিকেই পছন্দ করে।

একদিন শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পল্লীর সমস্ত মহিলারা নিকটবর্ত্তী এক শিবতীর্থে গমন করিলেন। প্রহরে প্রহরে তাঁহারা সে স্থানে পূজা প্রদান করিবেন এবং পর দিবস তাঁহারা সকলে সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। হিতলালের মাতাও পল্লী-সঙ্গিনীদের সহিত শিবতীর্থে গমন করিলেন, মাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া হিতলাল গৃহে রহিল।

কামাতুরা রমণী এই সুযোগ গ্রহণ করিল। গভীর রজনীতে সে হিতলালের গৃহে আসিয়া তাহাকে স্বগৃহে পূজার জন্য আহ্বান করিল। কহিল,—"প্রয়োজন-বশতঃ আমি পল্লবীসিনীদের সহিত শিবতীর্থে যাইতে পারি নাই, তুমি আসিয়া যদি আমার গৃহে শিবপূজা করিয়া দিয়া যাও, আমি বড়ই কৃতার্থ হই।"

বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করিয়া হিতলাল রমণীর গৃহে উপনীত হইল। কিন্তু পূজার কোনও আয়োজন না দেখিয়া বিস্মিত-ভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

রমণী গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া সলজ্জ-হাস্যে বলিল,—"যে পূজার জন্য তোমাকে আনিয়াছি, তাহার আয়োজন প্রস্তুতই আছে। এই সুখশয্যা তোমার অপেক্ষা করিতেছে, তুমি প্রসন্ন হইলেই হয়।"

হিতলালের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। এ রমণী কি বলিতেছে? একি উন্মাদরোগগ্রস্তা, না প্রেতাবিষ্টা? আতঙ্কে ও আশঙ্কায় শিহরিয়া হিতলাল আসন পরিহার করিয়া গাত্রোত্থান করিল।

রমণী বলিল,—"হিতলাল, প্রতি তীর্থে, প্রতি পীঠস্থানে শিব আজ পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইতেছেন। আর আমরাই কি আজ বিযুক্ত থাকিব? তুমিই আমার শিব, তুমিই আমার দেবাদিদেব মহাদেব—হে শম্ভো! আমার মনোরথ পূর্ণ কর।"

এতক্ষণ হিতলাল পথ হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল। রমণীর কথায় যেন সে পথ খুঁজিয়া পাইল। ললাটের কুঞ্চিত রেখা তার মিলাইয়া গেল; অধরে প্রসন্নতার স্মিত-হাস্য ফুটিয়া উঠিল; হিতলাল বলিল,—"ঠিক বলিয়াছ জননী। তুমি উমা, তুমি পার্ব্বতী, তুমি কালিকা, তুমি দাক্ষায়ণী। তোমার বদন মণ্ডলে ভব-ভয়-বিনাশিনী ভবানীর অভয়-মূরতি আমি দর্শন করিতেছি, দীন সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর।"

হিতলাল স্তুতি-পাঠ করিতে লাগিল,—“হে অম্বিকে, হে জগদীশ্বরি, হে দুর্গতি-নাশিনী দুর্গে, তুমি কামমোহের অতীত, কলুষ কামনার অতীত, ভোগবাসনার অতীত, ভবজায়া,— তুমি ত্রিপুর-মালিনী, রিপুকুল-মর্দ্দিনী, সদ্ভাববর্দ্ধিনী, জগৎ-পালিকা—তুমি এই অধম তনয়ের প্রণাম গ্রহণ কর।”

হিতলালের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা গঙ্গা-যমুনা-প্রবাহিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভক্তিগদগদ-কণ্ঠে রোমাঞ্চিত কলেবরে হিতলাল স্তব করিতে লাগিল,— “হে স্নেহময়ী জননী, হে গর্ভধারিণী, হে আমার শৈশব কালের স্তন্যরস-প্রদায়িনী, হে আমার চির-মঙ্গল-বিধায়িনি, অযোগ্য সন্তানের কোটি প্রণিপাত গ্রহণ কর।”

এত বড় একটা মাতৃভাবের আবেগের সম্মুখে পাপ-প্রলোভন আর কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? জাহ্নবীর উচ্ছ্বসিত বারিধারার সমক্ষে গজরাজ কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? রমণীর রতি-লালসচিত্ত দ্রবীভূত হইল, অন্তরের তীব্র অনুতাপ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল—হিতলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া সে বলিল,—“হে পিতা, হে জ্ঞান-দাতা, অপরাধ মার্জ্জনা কর, কলঙ্কিনীকে তোমার আশীর্ব্বাদের শক্তিতে মহাঘোর নরকপ্রদ পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার কর। কারণ, জিতেন্দ্রিয় পুরুষই ত্রিলোক-পাবন ভূত-ভাবন মহেশ্বর।”

ঘটনাগুলি গল্পের ছন্দে বলিলাম, কিন্তু এগুলি নিতান্তই গল্প নহে।

সত্য ঘটনা কাহিনীর চেয়ে শতগুণ আশ্চর্য্য—
যখনি আসিবে কাম-প্রলোভন বক্ষে ধরিও ধৈর্য্য।
"নারী মাত্রেই তোমার জননী"—সাধনার এই বীর্য্য
তরঙ্গাকুল ক্ষুব্ধ বারিধি ক'রে দেবে উত্তীর্য্য
বিশ্বাস কর নিজেরে,
বিশ্বাস কর নিজ চিত্তের স্থির চেতনার বীজেরে,—
তোমারে করিবে অটল অচল সচ্চিন্তারই শৌর্য্য,
মহামানবের পংক্তিতে তুমি হবে আচার্য্য-বর্য্য।

"সংযম-সাধন আর
অখণ্ড-চরিত্র-বল,
নিত্য-সুখ, নিত্যানন্দ
বৰ্দ্ধিত করে কেবল।"

—স্বরূপানন্দ—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাকারোপাসক বলিয়া অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীদের একটা বিরাট অংশকে নিন্দাই করুন, আর সমালোচনাই করুন, নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, সাকার ভাবে শক্তি-উপাসনা স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের পরিপুষ্টি-বিধানে সাধকদিগকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। জগন্মাতার মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া তাহার চিন্ময় ধ্যান নিয়ত সাধককে নিজ জননীরই স্নেহময়ী মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়াছে এবং গর্ভধারিণীরই অতুলনীয় ভালবাসাকে জগন্ময় বিস্তারিত করিয়াছে। এই হিসাবে, মাতা মেরীর উপাসকদিগের মধ্যেও যীশু-উপাসকদের অপেক্ষা স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার অধিকতর সৌকর্য্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি এবং ইহাও আমাদের ধারণা যে, আবাল্য ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও চিত্ত-সংযমের পদ্ধতিবদ্ধ সাধনার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত যে যে স্থলে যত জোর করিয়া নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার চেষ্টা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব পরিপোষণ তত কঠিন ও তত দুঃসাধ্য হইয়াছে।

সাকারোপাসনার পক্ষ সমর্থনের জন্য এই কথার অবতারণা করিতেছি না। যাহারা সাকার মাতৃভাবের সাধক, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্যই ইহার উল্লেখ করিতেছি।

মাতৃভাবের ভগবৎ-সাধক জানেন,—যিনি নিখিল চরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, যিনি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহেশ্বরী, যিনি বেদমাতা গায়ত্রী, জ্যোতির্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী সাবিত্রী, অজ্ঞাত বিনাশ-পটীয়সী সরস্বতী, যিনি দুর্গা, মহাকালী, ভুবনেশ্বরী, যিনি আদ্যাশক্তি, পরমানন্দরূপা, ব্রহ্মময়ী—সেই বিশ্বমাতা আর আমার মা এক, অভিন্ন। তিনি ইহাও জানেন, ঐ জগজ্জননীতে আর আমার মাতে যেমন ভেদ নাই, জগতে কোনও রমণীতে আর জগজ্জননীতে তেমন ভেদ নাই। তিনি আরও জানেন, আমার জননীতে আর যে কোনও রমণীতে ভেদ নাই। সমগ্র জগৎ তাহার কাছে মাতৃময় হইয়া যায়—যে দিকে চক্ষু ফিরান, সেই দিকেই তিনি মাকে দর্শন করেন। অপরূপ রূপ লাবণ্য-সম্পন্না সুহাসিনী রমণীমূর্ত্তি দর্শনে তাঁর নিজ জননীর মুখচ্ছবি মনে পড়ে। চারু নয়নযুগে তিনি নিজ জননীর পবিত্র স্নেহবর্ষী নয়ন-যুগল দেখিতে পান, সুবলিত সুন্দর ভুজযুগে তিনি জননীর বরাভয়-বিতরণকারী কর-পল্লব দেখিতে পান, পীনোন্নত কুচযুগে তিনি জননীর সেই পীযূষ-প্রদায়িনী পয়োধর দর্শন করেন, যাহার অমৃতধারা পান করিয়া বাল্যে জীবন রক্ষা হইয়াছিল। যে কোনও রমণীর নয়ন-মনোহর মৃদু-মন্থর গমনে তিনি নিজ জননীর গতিচ্ছন্দ নিরীক্ষণ করেন। বিহ্বল কণ্ঠে প্রেমাকুল আর্ত্ততায় তিনি গাহেন,—

মাতৃভাবে ভগবদুপাসনা

যে দিকে ফিরাইরে আঁখি
কেবল আমার মাকেই দেখি,
মা যে আমার বিশ্ব-জোড়া
ব্যাপিত সব জল-স্থল
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্ ?

ঐ যে নারী চল্‌ছে পথে
পায়ের নূপুর বাজিয়ে
ঐ যে নারী উঠল রথে
রূপের ডালি সাজিয়ে,
তাদের চোখে দেখ্‌ছি আমি
মায়ের চোখের নীলোৎপল।
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্ ?

ঐ যে নারী হাস্যময়ী
মধুর স্বরে গাইছে গান,
ঐ যে নারী বিশ্বজয়ী
নিচ্ছে কেড়ে সবার প্রাণ,
ঐ আননের জ্যোৎস্না-বিভায়
আমার মায়ের মুখ দেখা যায়,

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

ঐ কোকিলার আকুল-কণ্ঠে
মায়ের কণ্ঠ সমুচ্ছল।
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্ ?

আমার মায়ের নাই তুলনা
সব নারীতে আছে রে,
সবার চোখে, সবার মুখে,
সবার বুকের মাঝে রে ;
সব রমণীর সব-কিছুতে
আমার মা-ই স্নেহোজ্জ্বল।
মায়ের মতন অমন মধুর
তিন ভুবনে কে আর বল্ ?

রমণী কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি গাহেন,—

তোমার ভিতরে রহি'
আমারি জননী এ যে
হরিতেছে প্রাণ !
যে মধুর স্নেহ-ভাষে
বাঁধিয়া মমতা-পাশে
বুকের পীযূষ মাতা
করাইত পান,

মাতৃভাবে ভগবদুপাসনা

তোমার কাকলী আসি'
সে মধুর স্নেহ-রাশি
অকৃপণ করে মোরে
করিছে প্রদান।

কোনও রমণী কোনও কারণে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি গাহেন,—

ডাক্‌ছ আমায় কে তুমি
জানি আমি জানি গো,
ডাক্‌ছ আমায় ও জননী,
চিনি তোমার বাণী গো!

তুমিই আমার হৃদয়-মাঝে
স্নেহের বৃষ্টি বরষি
করলে সৃজন পবিত্রতার
স্নিগ্ধ শীতল সরসী,
সেই তড়াগের কমল-বনে
তুমিই কমল-রাণী গো।

হৃদয়-কুসুম ফুটল যে মা
তোমার স্নেহের পরশে,
ঘুমন্ত প্রাণ জাগ্‌ল যে মা
নিত্য-অভয় হরষে,

সেই কুসুমে, সেই পরাণে
পূজব চরণখানি গো।

নির্ভয় তাঁহার হৃদয়, নিশ্চিন্ত তাঁর চিত্ত, কারণ, তিনি যে জগন্মাতার কোলের ছেলে, একথা নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হন না। উদাত্ত-কণ্ঠে তিনি গাহেন—

কলুষ কালিমা মাখিয়া আমায়
মলিন করিবে কে রে ?
সকল পরাণ জুড়িয়া আমার
জননী যদি থাকে রে।

মায়ের স্তন্য অমিয়-ধারা
করিবে আমায় কামনা-হারা,
মায়ের আশিস মলয়-পবন
ধূলা-মাটি দেবে ঝেড়ে।

আমি যে মায়ের কোলের ছেলে,
মা কি মোরে কভু দিবে রে ফেলে ?—
দু'বাহু পসারি' করিবে রক্ষা
নিজ হৃদয়-মাঝে রে।

চিত্ত তাঁহার সকল সুখে সকল দুঃখে জগন্মাতার স্নেহের কোলেই নিজেকে দেয় স'পিয়া এবং প্রেম-গদ-গদ বিহ্বল কণ্ঠে সুমধুর গীতি-ধ্বনি উৎসারিত হয়,—

(ও মা) সকল হারাই যদি,
তবু যেন তব মধুমাখা নাম
মনে থাকে নিরবধি।

বেড়িয়া ধরিলে কামনার ফাঁস,
তা'তে যেন আমি না হই নিরাশ,
তোমার চরণে সকল ব্যাধির
মিলিবে মহৌষধ-ই!

খোয়ায়ে আমার সকল বিত্ত
তোমাতেই যেন ঢালি মা চিত্ত,
নামের প্রবাহে নয়নের ধারা
সৃজিবে প্রেমের নদী।

সাধন-সামর্থ্যের অপ্রতুলতা তাঁহাকে ভীতিগ্রস্ত করে না,—নিজের সমস্ত অসম্পূর্ণতা লইয়াই তিনি জগন্মাতার পাদপদ্মে নিঃসঙ্কোচে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দেন। তিনি গাহেন,—

সাধন-ভজন বিহীনে,
তুমি দয়া কর কিনা কে জানে?
দু'নয়নে যার বহেনি ধারা,
কোলে তুলে তারে নিবি কি তারা
তোর লাগি কভু কাঁদিনি জননী—জীবনে।

মা বলিয়া তোরে ডাকি নি ব'লে
আপনার ছেলে দিবি কি ফেলে,
চরম-শরণ করিবি না দান—চরণে ?

বস্তুত: শক্তি-সাধকের একান্নপীঠ, একান্ন মহাতীর্থ, জগজ্জননীকে অংশে অংশে পূজা করিবার জন্য একান্নটি সাধন-কুঞ্জ। দক্ষ-যজ্ঞে শিব-পত্নী সতী দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার দেহাংশ-সমূহ যে যে দেশে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান আজও মহাতীর্থরূপে পরিগণিত। কোথাও জননী সতীর চক্ষু, কোথাও কর্ণ, কোথাও ওষ্ঠ, কোথাও কেশ-পাশ, কোথাও হৃদয়, কোথাও পয়োধর, কোথাও গ্রীবা, কোথাও স্কন্ধ, কোথাও উদর, কোথাও নিতম্ব, কোথাও হস্ত, কোথাও চরণ, কোথাও জঙ্ঘা, কোথাও নাভি, কোথাও তল্প, কোথাও যোনিদেশ পতিত হইয়া এক এক অপরাজিত তীর্থের উদ্ভব হইয়াছে। সতীদেহ—মাতৃদেহ, সতীদেহাংশ মাতৃদেহেরই অংশ; অতএব, সতীদেহের প্রকাশ্য ও গুহ্য প্রত্যেকটি অঙ্গই সন্তানের নিকটে পরম পবিত্র ও পূজাস্থান। এইরূপ শুভ-কল্পনার আশ্রয় লইয়াই প্রতি দেহাংশের পতন-স্থলে মহাদেবীর এক একটি মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে এবং তাহার পূজাবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ, মাতৃ-অঙ্গের যে কোনও অংশই সম্পূর্ণা জননীর ন্যায়

সমাদরণীয়া। তাই, কোথাও মহিষ-মর্দ্দিনী, কোথাও জয়-দুর্গা, কোথাও ফুল্লরা, কোথাও উমা, কোথাও শিবানী, কোথাও মহালক্ষ্মী, কোথাও কুমারী, কোথাও চন্দ্রভাগা, কোথাও কালী, কোথাও দাক্ষায়ণী, কোথাও ভবানী, কোথাও ত্রিপুরা-সুন্দরী, কোথাও ভ্রামরী, কোথাও বিমলা, কোথাও অপর্ণা, কোথাও সর্ব্বাণী, কোথাও মহামায়া, কোথাও সাবিত্রী, কোথাও জয়ন্তী, কোথাও অম্বিকা, কোথাও গায়ত্রী, কোথাও নারায়ণী, কোথাও কামাখ্যা নামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়া জগন্মাতা সাকারা সসীমারূপে পূজিতা হন। ইহার ফল এই যে, কোথাও কোনও রমণীর গণ্ডস্থল দর্শন করামাত্র গোদাবরী তীরস্থিত সতীগণ্ডের স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "বিশ্বেশী"র কথা স্মরণ-পথে পতিত হয় এবং চিত্তে কোনও অসংবৃত ভাব মাথা জাগাইবার পূর্ব্বেই মাতৃভাবের আবেগাকুল-প্লাবনে তাহা ডুবিয়া যায়। কোথাও কোনও রমণীর ইন্দীবরলোচন নিরীক্ষণ মাত্র করবীরপুরে অবস্থিত শর্করার পীঠে সতী-চক্ষুর স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "মহিষ-মর্দ্দিনী"র কথা স্মৃতিপথে জাগরূক হয় এবং চিত্তে কোনও চাঞ্চল্য জন্মিবার পূর্ব্বেই চাঞ্চল্যের মূলীভূত কারণ অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়! কোথাও কোনও মনোহরা রমণীর তিল-ফুল-তুল্য নাসিকা দর্শন-মাত্র বরিশাল জেলায় অবস্থিত সুনন্দা পীঠে সতীনাসিকার স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "সুনন্দা" দেবীর চিত্র স্মৃতিপটে

অঙ্কিত হইয়া যায় এবং চিত্ত-চাঞ্চল্যকরী লালসা নিমেষমধ্যে নিঃস্তব্ধ হইয়া পড়ে। কর্ণদেশে দোদুল্যমান-কেয়ূরী কোনও রমণীর প্রতি দৃষ্টি পড়া মাত্র, কর্ণাট দেশস্থ সতীকর্ণস্থলাভিষিক্তা দেবী জগন্মাতা "জয়দুর্গা"র কথা স্মৃতিপটে আরূঢ় হয় এবং নিমেষমধ্যে মনের উচ্ছৃঙ্খলতাকে উপসংহৃত করে। কোনও মৃদুমন্দ-সুহাসিনী রমণীর তাম্বুল-চর্ব্বণে বিম্বকান্তি পরমপেলব অধর-পল্লব দর্শনমাত্র বীরভূমের অন্তর্গত আমোদপুরে অবস্থিত অট্টহাস তীর্থে সতীর ওষ্ঠস্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "ফুল্লরার" কথা তার মনে পড়ে এবং চকিতে চিত্তের যাবতীয় কন্দর্পতাপ নিরাকৃত হয়। কোনও সুভাষিণী রমণীর প্রাণ-মনোহারী প্রিয়-বচন-বিন্যাস শ্রবণ মাত্র জলন্ধরে অবস্থিত জ্বালামুখী-তীর্থে সতী-জিহ্বার স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "সিদ্ধিদা" দেবীর কথা মনে পড়িয়া যায় এবং ক্ষণকাল-মধ্যে চিত্তের চঞ্চলতামুখী উদ্দাম-প্রবণতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কোনও রমণীর গ্রীবাদেশ দর্শন মাত্র শ্রীহট্ট জেলায় শ্রীশৈল-পীঠে অবস্থিত সতীগ্রীবার স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "মহালক্ষ্মীর" কথা তাহার স্মরণে পড়ে এবং লালসাতুর মনকে নিমেষমধ্যে পবিত্রতা-সুন্দর ও সৌম্য-স্নিগ্ধ করে। কোনও রমণীর কমনীয় স্কন্ধদেশ দর্শনমাত্র ত্রিহুত জেলান্তর্গত জনকপুরে অবস্থিত মিথিলাপীঠে সতীস্কন্ধের স্থলাভিষিক্তা এবং কোনও রমণীর চিত্তহারী চাঁচর চিকুরদাম দর্শনমাত্র বৃন্দাবনে অবস্থিত সতী-কেশের স্থলাভিষিক্তা দেবী

জগন্মাতা "উমার" কথা স্মরণে জাগ্রত হয় এবং মনের শত প্রকার তরঙ্গায়িত অশুভ উচ্ছ্বাস আঁখির পলকে প্রশান্তি লাভ করে। কোনও রতি-বিনিন্দিত-রূপ-যৌবন-সম্পন্না রমণীর সুবলিত সুকোমল বাহু-যুগল দর্শন-মাত্র কাটোয়ার নিকটে অবস্থিত বহুলাতীর্থে অবস্থিত সতীর বামবাহুর স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "বহুলা"এবং সীতাকুণ্ডে অবস্থিত চট্টল-পীঠে সতীর দক্ষিণ বাহুর স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "ভবানীর" কথা মনে পড়িয়া যাইবে এবং মাতৃচিন্তার মধুরতা কাম-চিন্তার সবলতাকে নিঃশেষে জয় করিবে। কোনও পীবর-পয়োধরা স্তনভার-নমিতাঙ্গী পীনোন্নতবক্ষা দিব্যকান্তি রমণীর প্রতি নেত্রদ্বয় পতিত হইবামাত্র তাহার মনে জলন্ধরে অবস্থিত জালন্ধর-পীঠে সতীর দক্ষিণ স্তনের স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "ত্রিপুর মালিনীর" কথা, চিত্রকূট সন্নিকটে অবস্থিত রামগিরি তীর্থে সতীর বাম স্তনের স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "শিবানীর" কথা এবং দেওঘরে অবস্থিত বৈদ্যনাথ ধামে সতীর হৃদয়-স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "জয়দুর্গার" কথা জাগিয়া উঠিবে এবং ক্ষণোন্মত্ত মন্মথও অচিরে সকল উন্মাদনা পরিহার করিবে। উদরদেশ ত্রিবলিদামে সুশোভিতা, অনাবৃত-নাভি, পীনকটি, সুমধ্যমা রমণীর প্রতি নেত্রপাত হইলে দ্বারকার সন্নিকটস্থ প্রভাস তীর্থে সতীর উদরস্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "চন্দ্রভাগা" এবং উড়িষ্যাদেশে বিরজাক্ষেত্রে সতীর নাভিস্থলাভিষিক্তা

জগন্মাতা "বিমলার" মাতৃময়ী পুণ্যস্মৃতি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইবে এবং শরপরিত্যাগোন্মুখ অব্যর্থ-লক্ষ্য অনঙ্গের হস্ত হইতে বল-পূর্ব্বক ফুলধনু কাড়িয়া লইবে। কোনও অর্দ্ধাবৃতাঙ্গী সুশ্রোণী রমণীর কন্দর্প-কলা-বিস্তারিণী জঙ্ঘা ও জানু দর্শন মাত্র খাসিয়া পাহাড়ে অবস্থিত জয়ন্তী তীর্থে সতী-জঙ্ঘার স্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "জয়ন্তীর" এবং নেপালে অবস্থিত সতীর জানুস্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "মহামায়ার" স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়া তাহার চিত্তের সকল জঘন্য লোলুপতাকে উপশান্ত করে। পীবরোন্নত নিতম্বা অনবদ্যাঙ্গী অঙ্গনা দর্শনেও তাহার চিত্ত লালসা-ব্যাকুল হয় না,—কালমাধব তীর্থে সতীর নিতম্বস্থলাভিষিক্তা জগন্মাতা "কালীর" স্থিরোজ্জ্বলা স্মৃতি তাহার অন্তরের কলুষ বিনাশ করে। উপত্যকার ন্যায় সুবিস্তৃত বিশাল-জঘন-শালিনী রমণীও যদি তাহার নয়ন-পথে পতিত হয়, সে চঞ্চল হয় না, বগুড়া জেলান্তর্গত ভবানীপুরে অবস্থিত করতোয়া তীর্থে সতীতল্পাধিষ্ঠিতা জগন্মাতা "অপর্ণা" তাহার সকল কু-প্রবৃত্তি, সকল কলুষিত মনোভাব বিদূরিত করেন। এমন কি ষোড়শী রমণীর যোনি-প্রদেশ-সন্দর্শনে পর্য্যন্ত তার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বিকার জন্মে না, কামরূপান্তর্গত কামগিরি-তীর্থে সতীযোনির স্থলাভিষিক্তা মহাদেবী ভগবতী "কামাখ্যা" মাতা স্মৃতিপথে আবির্ভূতা হইয়া মৃদুহাস্যে স্নেহ-কর সঞ্চালনে সন্তান-চিত্তের সকল নিকৃষ্ট লালসা, কদর্য্য বাসনা, জঘন্য কামনা

অপসারিত করেন। একান্ন পীঠস্থানে তীর্থ-পর্য্যটনের ইহাই অমৃত-বারিধিসম অপরিমেয় সুফল, একান্ন দেবী-স্থানে জগজ্জননীর সাকার-বিগ্রহার্চ্চনের ইহাই গুহ্যাতিগুহ্য গুরু-বক্তু নিগূঢ় লোকাতীত রহস্য। এক সময়ে জীবন্ত নারী-বিগ্রহ সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া তাহার প্রতি অঙ্গে মনঃ-সন্নিবেশনপূর্ব্বক আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া অঙ্গে অঙ্গে স্তুতি-মন্ত্রাভিপবিত্র পুজাপুষ্পাঞ্জলি প্রদানের যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহারও ইহাই লোক-লোচনান্তরায়িত গহন-গুপ্ত মর্ম্ম-রহস্য।

কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, অধুনা লোকে একান্ন পীঠে তীর্থ-যাত্রা করে, দেবীস্থানে ভগবতীর অর্চ্চনা করে, কিন্তু তার অমৃতময় ফল অধিকাংশেই আহরণ করে না। কারণ, তাহারা উদ্দেশ্য-বিস্মৃত হইয়াছে,—আজ পুত্র লাভের জন্য, কাল মানসিক শোধের জন্য, পরশ্ব দেশ দেখিবার জন্য, পরদিন বন্ধুবর্গের অনুরোধে ইহারা তীর্থযাত্রা করে,—জীবনকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য নহে। ভোগৈশ্বর্য্যের কামনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনায় ইহারা তীর্থযাত্রা করে, তাই বর্ষে বর্ষে অম্বুবাচী সময়ে লক্ষ লক্ষ মানব কামরূপ তীর্থে কামাখ্যা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আসিয়াও নিয়ত পর-নারী-চিন্তন ও পরদারধর্ষণ অবাধে করিয়া বেড়াইতেছে। ভাবের ঘরে চুরিই তীর্থ-ভূমিসমূহকে এইরূপে বন্ধ্যাদশাপন্না করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবশ্য-স্মরণীয় কতিপয় কথা

অতি সংক্ষেপে আর দুই একটি কথা বলিয়াই এই গ্রন্থের উপসংহার করিব।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের যে সাধক, তাহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, স্বকীয় জননীকে যে শ্রদ্ধা করে না, অপর নারীতে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাহার পক্ষে নিতান্তই নিষ্ফল এবং হাস্যকর। যেখানে দেখিবে, স্বকীয় জননীর প্রতি সুগভীর ভক্তি নাই, সেখানে জানিবে, অন্য নারীতে মাতৃভাবের নাম দিয়া যে ভাবই আরোপ করিতে চাহ, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃভাব কখনই হইবে না ;— অধিকাংশ স্থলেই তাহা আত্মবঞ্চনার নামান্তর মাত্র হইবে। অতএব, সর্ব্বপ্রযত্নে মাতৃভক্তি বর্দ্ধনের জন্য প্রয়াস পাইবে।

মাতৃভক্তি বর্দ্ধনের উপায় বহু। তন্মধ্যে একটি উপায় হইতেছে, মাতৃভক্ত মহাপুরুষদের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ, অপর উপায় হইতেছে, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হিতলালের আচরণের অনুকরণ। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে মাতৃ-চরণ বন্দনা দ্বারা মাতৃভক্তি প্রবর্দ্ধিত হয় এবং প্রণতি-

কালে ললাট-দেশ মাতৃপদে অবনমিত করিয়া ভ্রূমধ্যে মনঃ—সংযমন পূর্ব্বক নিজ মাতাকেই জগৎ-প্রসবিনী বলিয়া চিন্তা করিলে এই ভক্তি অসামান্য উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি লাভ করে।

যে-সকল চিত্র-দর্শনে স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃবোধ সহজে জাগ্রত হয়, সেই সকল চিত্র সন্দর্শন করিবে। যথা,—যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ, কৌশল্যা-ক্রোড়-বিহারী শ্রীরামচন্দ্র, সদ্যঃপ্রসূত মায়াদেবী-তনয় শ্রীবুদ্ধ, মাতামেরীর বক্ষঃসংলগ্ন যীশুখ্রীষ্ট, কুটীর-সমাসীনা পল্লী-বধুর স্তন্যপানরত শিশু এবং চন্দ্র-দর্শন-নিরতা রাঙ্গা জননীর টুকটুকে নয়নানন্দ পুত্র প্রভৃতি। শুধু তাই নয়, চিত্র দেখিতে দেখিতে ধ্যান-বলে নিজেকেই ঐ শিশুর স্থলাভিষিক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং শিশুর জননীকে নিজ পরমারাধ্যা জননী বলিয়া কল্পনা করতঃ ভক্তি-ভরে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতে হইবে।

নারী-মাত্রকেই মাতৃ-সম্বোধন করিবে এবং যেখানে প্রকাশ্যে মাতৃ-সম্বোধন করা সমাজ-বিগর্হিত, সেখানে মনে মনেই মাতৃ-সম্বোধন করিবে। ছোট হউক, বড় হউক, সদ্‌বংশীয়া হউক, কি নীচকুলোদ্ভবা হউক,—এমন অভ্যাস করিবে, যেন দর্শন মাত্র অজ্ঞাতসারে মহামন্ত্র "মা" আপনা-আপনি উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করে।

নিষ্প্রয়োজনীয় স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক নারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ

হইতে যাইবে না এবং কার্য্যব্যপদেশে ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন পড়িলে, তুমি যে আদ্যোপান্ত পবিত্র মাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইবে। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় বা সন্দেহকে মনের কোণেও ঠাঁই দিবে না এবং মহামন্ত্র "মা" নাম নিরন্তর জপ করিতে কখনও উদাসীন বা হতোৎসাহ হইবে না।

কোনও নারীর কোনও দুঃখ, অপমান বা লাঞ্ছনা দর্শন করিলে নিজ জননীর দুঃখ, অপমান বা লাঞ্ছনা বলিয়া তাহা গণনা করিবে এবং মাতৃ-কর্ত্তব্য পালন করিতেছ বলিয়া অঙ্গীকার করতঃ আপ্রাণ-প্রয়াসে আত্মবলি দিতে নির্ভীক হইবে।

নারী সম্পর্কে কখনও কোনও ক্ষীণতম প্রলোভন উপস্থিত হইলেও উদ্দীপিত লালসাকে জন্মমাত্র বধ করিবার জন্য কৃতধী হইবে এবং প্রলোভনের কারণ বর্জ্জন করিয়া লোভনীয়া নারীর মূর্ত্তিমধ্যে নিজ জননীর পবিত্রতা-স্নিগ্ধ প্রসন্ন মূর্ত্তির অবস্থিতি ধ্যান করিবে।

সর্ব্বশেষ কথা এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত শক্তিশালী সদ্‌গুরুর কৃপাশ্রয়ে সাধনার পদ্ধতিবদ্ধ প্রণালী না পাইতেছ, ততদিন পর্য্যন্ত "মা" এই মহামন্ত্রকেই তোমার ত্রিসন্ধ্যায় ও রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে উপাসনার সিদ্ধ বীজ বলিয়া গণনা করিবে। প্রাণের অফুরন্ত আবেশ লইয়া উচ্চারণ কর সিদ্ধমন্ত্র "মা",

হৃদয়ের অনাবিল নির্ম্মলতা লইয়া চিন্তা কর মহামন্ত্র "মা", অন্তর জুড়িয়া জমাও ধ্যান—মায়ের, মাতৃরূপিণী মহাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া ধন্য হও, পুণ্য হও, সুন্দর হও, শুভ্র হও, "মা" —নামে প্রাণ তোমার জাগিয়া উঠুক। লক্ষ যুগের জড়তা, কোটি জন্মের তমসা মাতৃ-নামের বিদ্যুন্ময়ী তাড়নায় অবসাদ-গ্রস্ত হউক, বিধ্বংস-প্রাপ্ত হউক। বিশ্বাস কর এই মহানামে, এই মহাবীজে। মহামন্ত্র "মা" তোমার সকল দুর্ব্বলতা হরণ করিবে, সকল আপদুদ্ধার করিবে।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু
মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

মাতৃরূপে যেই দেবী
সর্ব্বভূতে করেন নিবাস
শতবার তাঁর পায়ে
প্রণমিয়া মিটে না পিয়াস।

—স্বরূপানন্দ—

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের সাধক, আজ তুমি উদাত্ত-কণ্ঠে গাহিতে থাক,—

ভৈরবী, একতালা

মঙ্গলময়ী মাগো আমার,
মঙ্গলময়ী মা।
যেদিকে নিরখি, কেবলি যে দেখি
তোমারি মধুরিমা॥
চন্দ্র-তপন জাগি' দিবারাতি
জননী গো তব করিছে আরতি;
কি রূপ-বিভায় সেজেছ মা আজ
নাহি যে তার সীমা॥

সুন্দর তব চরণ-যুগলে
দেব-কিন্নর মিলি দলে দলে
বন্দনা করে বিহ্বল প্রাণে
গাহি' তব মহিমা॥
অভয় তোমার কল্যাণ-করে
সাজিয়েছ বর-রাশি থরে থরে
ঘুচাবে কলুষ, কল্মষ, ব্যথা,
দুঃখ ও কালিমা॥

(সমাপ্ত)